সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

- বর্ষ : ৬৪
- সংখ্যা : ২১-২২
- বার : সোমবার

- ২০ ফেব্রুয়ারি- ২০২৩ ঈসায়ী
- ০৭ ফাল্গুন- ১৪২৯ বাংলা
- ২৮ রজব- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **উপ-সম্পাদকীয়** ০৪
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **কেন আমাদের এত সম্মান ও মর্যাদা!**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৬
- ✍ **প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা** ১০
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে বরাত উদযাপনের হুকুম**
    মূল : শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)
    ভাষান্তর : মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান- ১১
  - ❖ **বিশ্বনবী (ﷺ)-এর সমাজ সংস্কারের রূপরেখা**
    কে এম আব্দুল জলিল- ১৬
  - ❖ **মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণের ঘটনা**
    মো. গিয়াসুদ্দীন- ২০
  - ❖ **আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা**
    মাক্বসুদুর রহমান- ২৪
  - ❖ **কিয়ামতের ভয়ংকর প্রকম্পন**
    ডা. সুলতান আহমদ- ২৬
  - ❖ **তুরস্ক-সিরিয়ার ভূমিকম্প আমাদের সতর্কবার্তা**
    আব্দুল মুমিন- ২৯
- ✍ **সাহাবা-চরিত :**
  - ❖ **'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)**
    আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ৩০
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **নেক 'আমলের ওসিলা দিয়ে দু'আ করা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩৩
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ৩৫
- ✍ **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **ইসলামের আলোকে মাতৃভাষার গুরুত্ব-তাৎপর্য এবং ভাষাসৈনিকদের সম্মান-মর্যাদা**
    মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)- ৩৭
- ✍ **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **এসো আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি**
    আবু তাসনীম- ৩৮
- ☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৪০
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৮

সম্পাদকীয়

আমরি বাংলা ভাষা

*মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। এটি মহান আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের নৈপুণ্যতার অনন্য স্বাক্ষর। তিনি মানুষকে রূপ-রং ও আকৃতির ভিন্নতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তেমনি ভাষার ভিন্নতাও তার অনবদ্য সৃষ্টি। মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকে স্ব-স্ব জাতির ভাষায় অর্থাৎ- তাদের মাতৃভাষায় ওহী নাযিল করেছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আরবি। তাই তাঁর উপর আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে। প্রতিটি ভাষার উচ্চারণভঙ্গি ও উপস্থাপন শৈলিতার বিচারে আমরা দু'টি দিক পাই। **এক-** জাতীয় ভাষা এবং **দুই-** আঞ্চলিক ভাষা। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরবের সাত প্রকার আঞ্চলিক ভাষার রূপ দান করেছেন। তাই আল-কুরআনকে সাতটি আরবীয় আঞ্চলিক ভাষায় পড়া ও বুঝা যায়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জাতীয় আঞ্চলিক উভয় প্রকার ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন।*

আমরা বাংলাদেশি ও বাংলাভাষী। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলায় লিখি। আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলা। এ ভাষারও হরেক রকম আঞ্চলিক রূপ আছে। আমাদের ভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ভিন্ন রকম। এ সবই মহান আল্লাহর অশেষ নিয়ামত। মানুষ ভাষা চর্চা করে ভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভাষাবিদ হতে পারে। আঞ্চলিক বা চলিত ভাষাকে সাহিত্যে রূপ দিতে পারে; কিন্তু তারা ভাষার স্রষ্টা বলে দাবি করতে পারে না। পৃথিবীর সব ভাষার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাই এ ভাষাকে পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটাবার কারো কোনো অধিকার নেই। কেউ এরূপ অপচেষ্টা করলে তা ষোল আনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ভারত বিভক্তির পর আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলাম, পাকিস্তানি শাসক আমাদের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো। দাফতরিক ভাষা বাংলার বদলে উর্দু হবে বলে ফরমান জারি করলো, তখন বাংলার জনগণ তা মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-শ্লেগানে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মুখরিত হলো। মাতৃভাষা রক্ষার্থে মাঠে নেমে এলেন বাংলার দামাল ছেলেরা। সালাম বরকতেরা বিলিয়ে দিলেন বুকের তাজা রক্ত। মিছিলে মিছিলে উত্তাল ঢাকা নগরী। সবার কণ্ঠে একই কথা– 'মাতৃভাষা বাংলা চাই'। সেদিন ছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। দেশের আপামর জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে পাক শাসক নিজ সিদ্ধান্ত হতে পিছু হঠলেন। জনগণের দাবির কাছে মাথানত করলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন। ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা পেলো।

বলা যায়– পৃথিবীর একমাত্র দেশ বাংলাদেশ, যে দেশের জনগণ মাতৃভাষার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছে, রক্ত ও জীবন দিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। সেজন্য দেশের জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে এবং সরকারের প্রচেষ্টায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকভাবে মার্তৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যদিও ইসলামে দিবস পালনের কোনো বৈধতা নেই। তবু ভাষার মাস হিসেবে ফেব্রুয়ারিকে আমরা বিশেষ মর্যাদায় বিবেচনা করি। এ মাস আসলেই আমরা ভাষা আন্দোলনের মাস হিসেবে সগৌরবে মেতে উঠি। স্মরণ করি ভাষা সৈনিকদেরকে। তখন নাম নেই আব্দুস সালাম, আব্দুল জব্বার, রফিক ও বরকতদের। আমদানীকৃত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ভাষা সৈনিকদের স্মরণে পদযাত্রা, নিরবতা পালন ও পুস্পস্তবক অর্পণ করি। এতে কী লাভ হয় সালাম বরকতদের? আমরা জানি, নিজ অধিকার আদায়ের জন্য যারা মারা যান, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে শাহাদতের মর্যাদা পান। শর্ত হলো যদি তাদের ঈমান থাকে।

ভাষাসৈনিকদের প্রতি আমাদের করণীয় কী? আমরা যদি তাদের জন্য কিছু করতে চাই, তাহলে ইসলামী নির্দেশনা মেনেই আমাদেরকে কিছু করতে হবে। কেননা, আমরা মুসলিম। ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে কোনো কিছু করতে পারি না। ইসলাম বলেছে, মানুষ মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার 'আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল বাকি থাকে বহমান সাদাক্বাহ্, জ্ঞান বিতরণের ফলাফল ও সন্তানের নেক দু'আ। তাই মৃত ভাষা সৈনিকদের জন্য কিছু করতে হলে আমাদেরকে ইসলামী নীতি আর আদর্শ মেনে তাদের জন্য নাজাতের দু'আ করতে পারি। আর এ কাজ করলেই তারা উপকৃত হবেন। তাদের 'আমলনামায় সাওয়াব লেখা হবে। এ সৎকর্ম বাদ দিয়ে আমরা যা কিছু করছি, তা তাদের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। উপরন্তু আমরা অপসংস্কৃতির চর্চা করার কারণে উল্টো পাপের ভাগিদার হবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্য উপলব্দি করার এবং ইসলামী নীতি অনুসারে ভাষাসৈনিকদের জন্য পুণ্যময় কিছু করার তাওফীক দিন এবং আমাদেরকে অপসংস্কৃতির কবল হতে হিফাজত করুন –আমীন। ❑

উপ-সম্পাদকীয়

আহলে হাদীসগণ কোন দলের?

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

কুরআন ও সহীহ হাদীস যারা মেনে চলেন, তাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম 'আহলে হাদীস'। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ এবং প্রচার ও প্রসার আমাদের মৌলিক কর্মসূচি। শির্ক-বিদ'আত দূরীকরণ ও তাওহীদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য। দল-মত নির্বিশেষে কুরআন-সুন্নাহ'র অনুসারীগণ এই প্লাটফর্মে ভ্রাতৃপ্রতিম সহাবস্থান করে থাকেন। ১৯০৬ সালের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' নামক সর্বভারতীয় সংগঠন। এই সংগঠনটি ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে দাওয়াহ্ ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে। অর্থাৎ- জমঈয়তে আহলে হাদীস আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ একটি প্রাচীন সংগঠন। অবশ্য পরবর্তীতে নেতৃত্ব, আমিত্ব ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের মানসে সংগঠন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু উপদল সৃষ্টি হয়েছে। এ সংগঠনের অর্থাৎ- আহলে হাদীসগণের রাজনৈতিক কোনো উচ্চভিলাষ নেই। বরং ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের পরিগৃহীত নীতি। নেতৃত্বের আসনে সমাসীন নয়, প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে সংস্কারের মাধ্যমে শক্তিশালী করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

একথা সত্য যে, বাংলাদেশের মুসলিমগণ যেভাবে এ দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন, আহলে হাদীসগণও তার ব্যতিক্রম নয়। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তার সাথে সকলেই কম-বেশি সম্পর্ক ও সখ্য বজায় রাখেন। এর পেছনে দুনিয়াবি কোনো না কোনো স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। আহলে হাদীস পরিবারের অনেকেই এ দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলের সাথেও জড়িত। কেউ কেউ ঐসব দলের সক্রিয় নেতা, কর্মী বা সমর্থক। আহলে হাদীস পরিবারের অনেক ব্যক্তি সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর আসনে সমাসীন। তাঁরা দ্বীনী দাওয়াতি কাজের অংশ হিসেবে 'আহলে হাদীসগণের' সহায়তা করেন। এ কাজটি তাঁরা আত্মিক প্রশান্তি ও পরকালের মুক্তির আশায় করে থাকেন।

ঢাকা-১১ আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য আলহাজ্জ এ. কে. এম রহমতুল্লাহ এমপি সম্ভ্রান্ত আহলে হাদীস পরিবারের সন্তান। কিছু বিভ্রান্ত উগ্রপন্থির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে যখন ঢালাওভাবে আহলে হাদীসকে দোষারোপ করতে লাগলো, এমনকি 'জঙ্গি' তকমা দিতে শুরু করলো, তখন সাধারণ আহলে হাদীসগণ নানাভাবে হয়রানির শিকার হলেন। এহেন পরিস্থিতিতে আলহাজ্জ এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ এমপি মহোদয় সৎ সাহস নিয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীলের সাথে একাধিক বৈঠক করে 'আহলে হাদীস' সম্পর্কে প্রশাসন ও সর্বসাধারণের ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে সফল ও সক্ষম হলেন। তখন আমরা এম.পি মহোদয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলাম। দেশের কোথাও কোনো মসজিদ বিদআতি ও মাজারপূজারি দ্বারা আক্রান্ত হলে অথবা তাদের কঠোর বাধার কারণে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা অসম্ভব মনে হলে, উপায়ান্তর না দেখে আমরা প্রথমত আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে মাননীয় এম. পি মহোদয়ের শরণাপন্ন হয়েছি। তিনি তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে বলে মসজিদ করার পথ নিষ্কন্টক করতে এগিয়ে এসেছেন। মহান আল্লাহর মেহেরবানিতে অতঃপর তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরা চলার পথ বাধাহীন সুগম পেয়েছি– ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। অনুরূপভাবে ঢাকা দক্ষিণের সাবেক মেয়র আলহাজ্জ মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ-এর কাছে গিয়েছি। তাঁরাও উদার হস্তে এগিয়ে এসেছেন এবং আহলে হাদীসগণের মান-মর্যাদা রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন, যা কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না।

দেশের যত অরাজনৈতিক সংগঠন, সংস্থা বা দাওয়াতি কাফেলা রয়েছে, তারা কমবেশি নির্বাচিত সরকারের আনুকূল্য লাভ করেই নিজ নিজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আহলে হাদীসের যেসব ভাইয়েরা জমঈয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, তারা কোনো সময় সরকারি দলের আনুকূল্য লাভ করেননি, এ কথা বলার

---

* *সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস ও সম্পাদক - সাপ্তাহিক আরাফাত- ঢাকা।*

সৎসাহস তাদের নেই। মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সালমান এফ. রহমানের সহযোগিতা নিতে কোনো দোষ নেই! রাজশাহীতে মাননীয় মেয়র আলহাজ্জ খায়রুজ্জামান লিটন-এর সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে কাজ করা দোষের নয়! এমনকি কমরেড ফজলে হোসেন বাদশা এম.পি'র মতো কট্টর স্যাকুলারদের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে দেখেও তাদের অন্ধ অনুসারীরা না দেখার ভান করে থাকে। এটা কি সত্যের অপলাপ নয়?

আজ যতো গর্জন দিয়ে আহলে হাদীসের স্বকীয়তার কথা বলা হচ্ছে– এমন ব্যক্তিদেরকে তো মাননীয় এম.পি. আলহাজ্জ এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ'র কাছে তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টায় একাধিকবার ধর্ণা দিতে দেখা গেছে, একথা সকলেই জানেন। তার পরও কি আপন স্বচ্ছতার বুলি আওড়িয়ে যাব? নিজের সাধুতার সাফাই গাইবো?

আমরা আগেই বলেছি, বাংলাদেশের সকল আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে না। সংসদে প্রদত্ত মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ'র ভাষণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু বাস্তবতার আয়নায় দেখলে বুঝতে কারো কষ্ট হবে না যে, তাঁর বক্তব্যে কিছু পজিটিভ দিকও আছে– তিনি সগর্বে নিজেকে আহলে হাদীস পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে এ দেশে আহলে হাদীসের রিজার্ভ ভোট আছে। আহলে হাদীসগণ এ দেশের বৈধ নাগরিক। তাদের কথা বলার, রাজনীতি করার এবং দাওয়াত ও তাবলীগ করার নৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার আছে। দেশ ও জাতি গঠনে আহলে হাদীসগণ যথাসাধ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাদেরকে কোনোভাবে অবমূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। যারা না জেনে আহলে হাদীসকে ভিন্ন নামে তকমা দেওয়ার হীন চেষ্টা করে, তারা আজ সংসদে প্রদত্ত ভাষণের মাধ্যমে আহলে হাদীসগণের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অবহিত হলো। সংসদে আরও কতজন এম.পি. আছেন, তারও একটা পরিসংখ্যান জানা গেল।

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" একটি অরাজনৈতিক দাওয়াতি সংগঠন। কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর প্রচার ও প্রসরে এর অবদান সর্বজনবিদিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এটি কোনো রাজনৈতিক দলের 'এ' টিম বা 'বি' টিম নয়; বরং বিশুদ্ধ দাওয়াতের এক বিশেষ প্লাটফর্ম হওয়ায় এখানে দেশের জ্ঞানী-গুণী, প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সাধারণ জনগণ পরকালীন মুক্তির আশায় যথাসাধ্য অংশ নিয়ে থাকেন। এ কল্যাণকর দলের দরজা সকল মুসলিমের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। কাজেই শুধু কোথায় নেগেটিভ দিক আছে, তা অনুসন্ধানের সংকীর্ণ গণ্ডি হতে বেরিয়ে উদার দৃষ্টিতে তাকাই, তাহলে ভালোকে ভালো বলার মেজাজ তৈরি হবে এবং পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব; আর অপরের প্রতি সমালোচনার কদর্যতা ত্যাগ করে মুক্ত ও পবিত্র জীবন লাভ করব। ফলে দুনিয়ায় হব সুখী এবং আখিরাত হবে সাফল্যময়। ❑

উদাত্ত আহ্বান

জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস উলামায়ে কিরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান!** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন –আমীন।

আল কুরআনুল হাকীম

কেন আমাদের এত সম্মান ও মর্যাদা!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ○ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا﴾

সরল বঙ্গানুবাদ

"আর অবশ্যই আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি; জলে স্থলে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক (জীবনোপকরণ) এবং আমার সৃষ্টির অনেকের উপর তাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (স্মরণ করো সেই দিনের কথা) যখন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমাম (নেতা)-সহ ডাকব। যাদেরকে ডান হাতে 'আমলনামা দেওয়া হবে তারা তা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"[১]

অবতরণের সময়কাল

আয়াত দু'টি সূরা বানী ইসরাঈলের। সূরা বানী ইসরাঈলের প্রথম আয়াত এ কথা ব্যক্ত করে যে, মি'রাজের সময় এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। হাদীস ও সীরাতের অধিকাংশ বর্ণনা অনুসারে হিজরতের একবছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং একথা স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কীজীবনের শেষের দিকে সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু

আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার অন্যান্য সকল সৃষ্টি থেকে মানুষকে যে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন তা ব্যক্ত করে। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। আর শেষের আয়াতটিতে হাশ্‌রের মাঠে মানুষের 'আমলনামা প্রাপ্তি ও পাঠের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ

وَ এবং, আর। لَقَدْ كَرَّمْنَا অবশ্যই আমরা সম্মানিত করেছি। بَنِيْٓ اٰدَمَ আদম সন্তানকে। حَمَلْنٰهُمْ আমরা তাদেরকে বাহন দিয়েছি। فِيْ মধ্যে। الْبَرِّ স্থলে। وَالْبَحْرِ আর জলে। وَرَزَقْنٰهُمْ আর আমি তাদেরকে রিযিক দিয়েছি। مِّنَ হতে বা থেকে। الطَّيِّبٰتِ ভালো, উত্তম। وَفَضَّلْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি। عَلٰى উপরে। كَثِيْرٍ অনেক, বহু। مِّمَّنْ যাদের। خَلَقْنَا আমরা সৃষ্টি করেছি। تَفْضِيْلًا ভালোবেসে, পছন্দ করে। يَوْمَ সেই দিন। نَدْعُوْا আমরা ডাকবো। كُلَّ اُنَاسٍ সকল মানুষকে। بِاِمَامِهِمْ তাদের ইমামসহ। فَمَنْ اُوْتِيَ অতঃপর যাকে দেওয়া হবে। كِتٰبَهٗ তার কিতাব ('আমলনামা)। بِيَمِيْنِهٖ তার ডান হাতে। فَاُولٰٓئِكَ অতঃপর তারা। يَقْرَءُوْنَ তারা পাঠ করবে। كِتٰبَهُمْ তাদের কিতাব। وَ এবং, আর। لَا يُظْلَمُوْنَ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। فَتِيْلًا অনুপরিমাণ।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ﴾

"আর অবশ্যই আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি।"

আদম সন্তানের এ সম্মান আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। যেমন- আকার-আকৃতির দিক দিয়েও তিনি আদম সন্তানকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسٰنَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা বানী ইসরাঈল/ইস্‌রা : ৭০-৭১।*

অর্থাৎ- "আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।"[২] মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে তিনি সকল মানুষকে দিয়েছেন সুন্দর চেহারা, সুশ্রী অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সুষম দেহ-প্রকৃতি। মানুষকেই কেবল দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি দেওয়া হয়েছে। খাওয়া-পরা ও কাজ-কর্মের জন্য হাত দেওয়া হয়েছে। মানুষকে চোখ, কান ও অন্তর দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে, বিবেক-বুদ্ধি ও কর্মের স্বাধীনতা। আবার কর্মেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজেদের আরাম ও আয়েশের জন্য অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে। মানুষ তৈরি করেছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা, এমন সব পোশাক আবিষ্কার করেছে এবং এমন সব জিনিস বানিয়েছে যা তাদেরকে গ্রীষ্মের তাপ, শীতের ঠান্ডা ও অন্যান্য সকল ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। অন্য কোনো প্রাণীকে তা দেওয়াও হয়নি। চারিত্রিক উৎকর্ষতার সুযোগও শুধু মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি তার ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তার পছন্দ-অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে দূরে থেকে আল্লাহ ভীতি (তাক্বওয়া) অর্জন করতে পারে। তখনই মানুষ হবে স্বয়ং শ্রষ্টার কাছেও সত্যিকারার্থে সম্মানিত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ﴾

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে ব্যক্তি অধিক তাক্বওয়া সম্পন্ন।"[৩]

﴿وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾

"জলে স্থলে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি।"

যাতায়াতের জন্য মানুষ বিবেক-বুদ্ধি ও ওয়াহী দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান খাটিয়ে জলে বাহন হিসেবে নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ ব্যবহার করছে। আর স্থলে ব্যবহার করছে– ঘোড়া, গাধা, খচ্চর. উট, হাতি। গরু-ঘোড়া ও মহিষ চালিত গাড়ি। তাছাড়া মানুষ বিভিন্ন সৃষ্টিবস্তুর সংমিশ্রণে তৈরি করেছে– সাইকেল, মটরসাইকেল, রিকশা, টেম্পু, ভ্যান, অটো, প্রাইভেটকার, বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। এগুলোতে মানুষ শুধু আরোহনই করে না। পণ্যসামগ্রী আমদানি-রফতানি করতেও এগুলোর ব্যবহার হয়।

﴿وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ﴾

"আর আমি তাদেরকে দিয়েছি উত্তম জীবনোপকরণ।"

মানুষকে দেওয়া হয়েছে সুস্বাদু ও মজাদার, শক্তিবর্ধক ও পরিতৃপ্তিকর ফল-মূল, ধান-গম ও নানান যৌগিক খাদ্য। পুকুর-খাল-বিল, নদী-নালা ও সাগর-মাহাসাগরে হরেকরকমের মৎস্যজাতীয় খাদ্য। পশু-পাখি, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল ইত্যাদির সুস্বাদু গোশ্তও মানুষকে দেওয়া হয়েছে খাদ্য হিসেবে। আর পানীয় হিসেবে– দুধ, মধু, সিরকা ও ডাবের পানি মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ।

﴿وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾

"এবং আমার সৃষ্টির অনেকের উপর তাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মাটি দিয়ে আদি পিতা আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করে ফেরেশ্তাদের দিয়ে সম্মানসূচক সিজদাহ্ করিয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর যখন আমি ফেরেশ্তাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদাহ্ করো, তখন তারা সকলে সিজদাহ্ করল একমাত্র ইবলিশ ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। সে হলো কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।"[৪]

আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ থেকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর এমনকি ফেরেশ্তাদের উপরও আদম ﷺ-এর সম্মান প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত।

﴿يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾

"যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমামসহ ডাকব।"

এখানে দিন বলতে বিচারের দিনকে বুঝানো হয়েছে। সেইদিন বিচারের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রত্যেক

[২] *সূরা আত্ তীন : ৪।*
[৩] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৩।*
[৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৪।*

মানুষকে তাদের ইমামসহ ডাকবেন। এখানে ইমাম বলে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এখানে ইমাম বলে নেতাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেদিন তাদের নেতার নাম ধরে ডাকা হবে এবং এক জায়গায় একত্রিত করা হবে। (উদাহরণস্বরূপ) বলা হবে– ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দল, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দল। এভাবে সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম)-এর অনুসারীকে তাদের নবী (আলাইহিমুস সালাম)-এর নাম নিয়ে ডাকা হবে।[৫] এ অর্থের সপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এ বাণী–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল রয়েছে। আর বিচারের দিন সে রাসূল যখন আসবে তখন তাদের মধ্যে ন্যায়সংগত মীমাংসা করা হবে, একটুও জুলুম করা হবে না।"[৬]

তাছাড়া এই একই অর্থে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে আরো কয়েকটি আয়াত রয়েছে। যেমন- সূরা আন্ নিসা : ৪১। সূরা আন্ নাহ্ল : ৮৪ ও ৮৯। সূরা আল হাজ্জ : ৭৮। সূরা আল ক্বাসাস : ৭৫। সূরা আয্ যুমার : ৬৯। সলফে সালেহীনের কেউ কেউ এর দ্বারা হাদীসের প্রকৃত অনুসারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদার কথা বলেছেন। কেননা, তাদের নেতা স্বয়ং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আর সে দিন তাঁর নাম ধরেই তাদেরকে ডাকা হবে।

কোনো কোনো মুফাস্সির এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন কিতাব বা গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুল-ভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন- কোনো অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়। গ্রন্থকে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাও ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ﴾

অর্থাৎ- "আর প্রত্যেক বস্তুই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে গুনে রেখেছি।"[৭]

এর সমর্থনে কুরআনে আরো কিছু আয়াত রয়েছে। যেমন- সূরা আল কাহ্ফ : ৪৯, সূরা আল জা-সিয়াহ্ : ২৮ ও ২৯, সূরা আয্ যুমার : ৬৯, সূরা আন্ নিসা : ৪১। সুতরাং এ আয়াতে বিচারের জন্য তাদের গ্রন্থকেই ('আমলনামাকেই) ইমাম বলে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। ইমাম শাওকানী ও ইবনু কাসীর এই মতই ব্যক্ত করেছেন। আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে– যাদের ডান হাতে তাদের 'আমলনামা দেওয়া হবে, তারা তা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। অনুরূপ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ﴾

অর্থাৎ- "তখন যাকে 'আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে লও, আমার 'আমলনামা পড়ে দেখো।" তারপর সে বলবে–

﴿إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾

অর্থাৎ- "আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন করা হবে।"[৮] আর যাদের 'আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, তারা সেদিন বলবে–

﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ﴾

অর্থাৎ- "আমি যদি আমার হিসাব কি তা না জানতাম!"[৯]

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়– হাশ্রের মাঠে 'আমলনামাসহ বিচারের জন্য ডাকা হবে সুতরাং ইমাম বলে 'আমলনামাকেই বুঝানো হয়েছে। উভয় তাফসীরে অর্থাৎ- ইমাম বলে নেতা বা কিতাব উদ্দেশ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, 'আমলনামার উপর সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যেক উম্মাতের নবীদেরকে উপস্থিত করা হবে। তাঁরা সেগুলোর সত্যায়ন করবে।[১০] যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾

---

[৫] *ফাতহুল কাদীর।*
[৬] *সূরা ইউনুস : ৪৭।*
[৭] *সূরা ইয়া-সীন : ১২।*
[৮] *সূরা আল হা-ক্বক্কাহ্ : ১৯-২০।*
[৯] *সূরা আল হা-ক্বক্কাহ্ : ২৬।*
[১০] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

অর্থাৎ- "সে সময় কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর সাক্ষীরূপে।"[১১]

﴿فَمَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ﴾

"যাদেরকে ডান হাতে 'আমলনামা দেওয়া হবে তারা তা পাঠ করবে।"

ঈমানদার, মুত্তাক্বী, মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ডান হাতে 'আমলনামা দেওয়া হবে। 'আমলনামা পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। খুশিতে অন্যদেরকেও এ 'আমলনামা দেখাবে ও পাঠ করাবে।[১২]

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

"এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"

এখানে সামান্য পরিমাণ বুঝাতে فَتِيلًا শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ- অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা সুতা। খেজুরের আঁটির ফাটলে অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা যে সুতো থাকে তাকেই فَتِيلٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য- অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

আদম সন্তানের কেন এত সম্মান ও মর্যাদা

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আদম আলাইহিস সালাম-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তিনি 'কুন' বললেই সৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই আদমকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। আদম ও তার সন্তানদেরকে তিনি জ্ঞান দান করেছেন। ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের জন্য বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। ইচ্ছা শক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে সকল সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে মানুষ এই পৃথিবীতে থেকেই আকাশপানে দৃষ্টি দেয়, গ্রহ-তারার গতি-বিধি লক্ষ্য করে। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের পোষ মানায়। শক্তিতে কম হওয়া সত্ত্বেও ঘোড়া, উট ও হাতির পিঠে চড়ে বেড়ায়। বিদ্যা-বুদ্ধি খাটিয়ে এমন জাহাজ বানায় যা দিয়ে ভূমণ্ডল ও নবমণ্ডল ভ্রমণ করা যায়।

[১১] *সূরা আন্ নিসা : ৪১।*
[১২] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

শিক্ষাসমূহ

এ আয়াতদ্বয় থেকে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষা নেয়া উচিত।

এক. মহান স্রষ্টার অসীমদয়ায় মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ যেন তার এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে নিজের জীবন কাটায়।

দুই. জলে-স্থলে ভ্রমণ করার সময় মানুষ যেন মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং তার সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে।

তিন. জীবনোপকরণ হিসেবে যে উত্তম খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন মানুষ যেন তা সাদরে গ্রহণ করে। আর খাবারের অযোগ্য নিষিদ্ধ জিনিস যেমন- তামাক-জর্দা-গুল, বিড়ি-সিগারেট. ইয়াবা-মদ ইত্যাদি যেন পরিহার করে সুস্থ ও সুন্দর জীবন উপভোগ করে।

চার. হাশ্‌রের মাঠে মানুষকে তার কৃতকর্মসহ ডাকা হবে। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে প্রতিটা কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঁচ. নেতার নাম ধরে যেহেতু বিচারের দিন ডাকা হবে সেহেতু দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে।

ছয়. সকলকেই ডান হাতে 'আমলনামা পাওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টা-ফিকির করতে হবে। কেননা, বিচারের দিন তারাই আনন্দিত হবে যারা ডান হাতে 'আমলনামা পাবে।

সাত. দুনিয়ার প্রতিটি কর্মের বিনিময় পরকালে দেওয়া হবে। সেখানে কারো উপর কোনোরূপ জুলুম করা হবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যতদিন থাকব, ভালো কাজ করার চেষ্টা করব।

উপসংহার

সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি– মানুষ। যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উচিত তাঁর সম্মান ও মর্যাদার কথা মনে রেখে অমানবিক ও পাশবিক জীবন পরিহার করে চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে একটু একটু করে গঠন করা। ইহ-পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভে চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হওয়ার বিকল্প নেই। দরবারে এলাহীতে বিনীত প্রার্থনা- তিনি যেন আমাদেরকে আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করেন –আমীন। ❑

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

⊡ عَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ : «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِيْ حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟» قُلْتُ : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ : «لَا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوْا».

⊡ মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দার ওপর মহান আল্লাহর হক্ব কী? এবং মহান আল্লাহর ওপর বান্দার হক্ব কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার ওপর মহান আল্লাহর হক্ব হলো– বান্দা তাঁর 'ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ তা'আলার ওপর বান্দার হক্ব হলো– তাঁর 'ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা এ কথার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। *(সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩)*

⊡ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

⊡ উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন 'আমল করল, যা আমার আদেশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী- হা. ২৬৯৭; মুসলিম- হা. ১৭১৮; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৬০৬)*

⊡ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ : «كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ : «مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى».

⊡ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাতের সকলেই জান্নাতে যাবে; তবে সে নয়, যে অস্বীকার করবে। তাঁকে (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– (জান্নাতে যেতে) কে অস্বীকার করবে? তিনি (ﷺ) বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্য হবে, সে-ই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করলো। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৮০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৩৫)*

⊡ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».

⊡ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল কিংবা সন্ধ্যা– যখনই মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তা'আলা তখনই তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতে থাকেন। এভাবে যতবার সে গমন করবে (ততোবার)। *(সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ৬৬২; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬৭ ও ৬৬৯)*

⊡ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

⊡ 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে স্বীয় অন্তর ও মুখমণ্ডলকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হবে। *(সহীহ মুসলিম- মা. শা., হা. ১৭/২৩৪)*

প্রবন্ধ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে বরাত উদযাপনের হুকুম

মূল : শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)

ভাষান্তর : মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান*

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"[১৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾

"তাদের কি এমন শরীক-দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"[১৪]

সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিমে রয়েছে– 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : "যে আমাদের এই দ্বীনে নয়া প্রথা আবিষ্কার করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে– "যে ব্যক্তি এমন এক কাজ করল যার ব্যাপারে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে– জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জুমু'আর খুৎবায় বলতেন : (মহান আল্লাহর প্রশংসা স্তুতিজ্ঞাপন পর) "নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হলো মহান আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) আর সর্বোত্তম হিদায়াত (তরীকা) হলো মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিদায়াত (তরীকা)। নিকৃষ্টতম বিষয় হলো বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।"

এগুলো ব্যতীত এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আর এগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, তাঁর নিয়ামত তথা অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করেছেন।

দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর পরেই তিনি তাঁর নবীর মৃত্যুদান করেন। তাই তো তিনি উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়তের সবকিছু বর্ণনা করে দিয়েছেন।

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ত বিষয় নতুনভাবে আবিষ্কার করে দ্বীন ইসলামের মধ্যে সম্পৃক্ত করবে তা সম্পূর্ণই বিদ'আত, যা প্রত্যাখ্যান যোগ্য। যদিও তার উদ্দেশ্য ভালো হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইসলামের মনীষীবর্গও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, তাই তাঁরা এই সমস্ত বিদ'আতকে অপছন্দ এবং তা থেকে সতর্ক করে সুন্নাতের গুরুত্ব ও বিদ'আতের অগ্রহণীয়তা বিষয়ে কিতাব লিখেছেন– যেমন- ইবনু ওজ্জাহ, তারতুশী, আবূ শামাহ প্রমুখ।

কতিপয় লোক যে সমস্ত বিদ'আত চালু করেছে তার মধ্যে ১৪ই শা'বানের রাত্রি বা শবে বরাতের বিদ'আত একটি। এই তারিখকে রোযার জন্য নির্ধারিত করার এমন কোনো দলিল নেই যার উপর নির্ভর করা জায়িয এবং শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে যঈফ বা দুর্বল যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করাও জায়িয নয়। আর শবে বরাতের নামাযের ফযীলত বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সমস্তই মওযূ বা জাল। যেমন- এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন বহু উলামায়ে কিরাম। এ বিষয়ে শাম (সিরিয়া) ও অন্যান্য এলাকার কতিপয় সালাফে সালেহীন থেকেও বর্ণনা এসেছে। তাদের কিছু কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

জমহুর উলামায়ে কিরামের মত : শবে বরাত উদযাপন করা বিদ'আত, এর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত সমস্ত হাদীসই যঈফ এবং কতিপয় মওযূ বা জাল। জমহুর উলামার মধ্যে ইবনু রজব তাঁর লাতাইফুল মা'রিফ কিতাবে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন : ঐ যঈফ হাদীসসমূহ 'ইবাদতে 'আমলযোগ্য যার মূল সহীহ হাদীসসমূহে সাব্যস্ত। আর শবে বরাত উদযাপনের জন্য এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই যার ভিত্তিতে যঈফ হাদীসে তৃপ্ত হওয়া যাবে। আবূল 'আব্বাস শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি বর্ণনা করেন।

প্রিয় পাঠক! কতিপয় উলামায়ে কিরাম এ মাসআলার ক্ষেত্রে যা বলেছেন তা আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি।

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১৩] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩।*

[১৪] *সূরা আশ্ শূরা- : ২১।*

মানুষ যে সব মাসআলায় মতভেদ করবে সে মাস'আলাকে মহান আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন। অতএব কুরআন ও হাদীসে যে সব ফয়সালা রয়েছে বা উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটিতে যে বিধান রয়েছে তাই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং তা অনুসরণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যেসব মাসয়ালা কুরআন হাদীসবিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। আর যে 'ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি তা বিদ'আত। দাওয়াত ও তাবলীগে এবং সে বিষয়ে প্রশংসা অর্জনের জন্য তা পালন করা জায়িয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِيْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে শাসকবর্গ রয়েছেন, কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, এটিই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[১৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।"[১৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ﴾

"বলো! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।"[১৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসংবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।"[১৮]

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে– "আর তা মতভেদপূর্ণ মাসয়ালাগুলোকে কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং উভয়ের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করে, নিশ্চয় সেটি ঈমানেরই দাবি ও বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকর এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।"

হাফেয ইবনু রজব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর লাতায়িফুল মা'আরিফ কিতাবে এ মাসআলায় তাঁর পূর্বোল্লেখিত কথার পর বলেন : "শামের তাবেয়ীগণ যেমন- খালেদ ইবনু মাদান, মাকহুল, লোকমান ইবনু আমের প্রমুখ শবে বরাতকে সম্মান করত এবং ঐ রাতে 'ইবাদতের জন্য পরিশ্রম করত ও তার ফযীলত ও মর্যাদা বহুলোক তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে; এমনকি কথিত রয়েছে যে, তাদের নিকট এ বিষয়ে ইসরাঈলী ঘটনাবলীর কিছু বর্ণনা পৌঁছে। অতঃপর যখন তা তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করে তখন লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাই তাদের মধ্যে কেউ তা গ্রহণ করে এবং তার মর্যাদার ব্যাপারে তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে, তাদের মধ্যে আহলে বসরার (আহলে ইরাকের) একদল আবেদ ও অন্যরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

হিজাযের অধিকাংশ (মক্কা-মদীনা এলাকার) উলামায়ে কিরাম এটাকে অপছন্দ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : 'আত্বা ও ইবনু আবি মুলাইকা, আর এটি 'আব্দুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনু আসলাম আহলে মদীনার ফকীহদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন। এটি ইমাম মালিকের অনুসারী ও অন্যদেরও মত এবং তারা বলেন : শবে বরাতের সবকিছু বিদ'আত।

আহলে শামের উলামায়ে কিরাম শবে বরাত পালনের পদ্ধতি নিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

প্রথম (যারা শবে বরাত উদযাপন বৈধ মনে করেন তাদের মত) : উক্ত রাত মসজিদে জামা'আতবদ্ধভাবে উদযাপন করা মুস্তাহাব। খালেদ বিন মাদান, লোকমান বিন আমির প্রমুখ ব্যক্তি শবে বরাতে উত্তম পোশাক পরিধান, সুগন্ধী ও সুরমা ব্যবহার করতেন এবং মসজিদে রাত্রিযাপন করতেন। ইসহাক ইবনু রাহওয়াই তাদেরকে এ ব্যাপারে সমর্থন

[১৫] *সূরা আন্ নিসা : ৫৯।*
[১৬] *সূরা আশ্ শূরা- : ১০।*
[১৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩১।*
[১৮] *সূরা আন্ নিসা : ৬৫।*

করেন এবং তিনি জামা'আতবদ্ধভাবে মসজিদে উক্ত রাত্রিযাপনের ব্যাপারে বলেন, এটি বিদ'আত নয়। হারব কিরমানী তার মাসায়েল কিতাবে সেটি উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় (যারা শবে বরাত উদযাপন বৈধ মনে করে তাদের মত) : শবে বরাতে মসজিদে নামায, কিসসা-কাহিনি ও দু'আ প্রার্থনার জন্য একত্রিত হওয়া মাকরূহ আর একাকী নিজে নিজে নামায আদায় করা মাকরূহ নয়। এটি আহলে শামের ইমাম, ফকীহ ও আলেম এবং আউযায়ীর মত এবং এটিই ইন্‌শা-আল্লাহ নিকটবর্তী মত।

শবে বরাতের ব্যাপারে ইমাম আহমদের কোনো মত জানা যায় না, তবে এ রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাবের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে দু'টি বর্ণনা নকল করা হয়। তাঁর দুই বর্ণনার মধ্যে উভয় ঈদের রাত্রিযাপন রয়েছে। একটি বর্ণনায় দলবদ্ধভাবে রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাব নয়, কেননা নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবা থেকে তা নকল করা হয়নি।

অন্য বর্ণনায় তিনি উক্ত রাত্রি জাগরণকে মুস্তাহাব বলেছেন, কেননা তা 'আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ পালন করেছেন আর তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং অনুরূপভাবে শবে বরাত উদযাপনের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবা থেকে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে আহলে শামের বিশেষ কতিপয় ফকীহ তাবেয়ীদের একদল থেকে বর্ণিত বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, শবে বরাত উপলক্ষে নবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ থেকে কোনো কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। আর আউযায়ী (রহিমাহুল্লাহ)'র এককভাবে শবে বরাত উদযাপনের বৈধতার রায় দেয়া এবং উক্ত রায় হাফেয ইবনু রজবের ইখতিয়ার করা একটি দুর্বল ও অভিনব ব্যাপার। কেননা যেসব বিষয় শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত নয় তা মুসলমানের জন্য 'আমল করা জায়িয নয়, চাই তা এককভাবে বা জামাতবদ্ধভাবে কিংবা চাই তা গোপন বা প্রকাশ্যে হোক। কেননা নবী (ﷺ) বলেন : "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[১৯]

এটি ছাড়াও বিদ'আত পরিত্যাগ ও তা থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ বক্‌র তারতুশী (রহিমাহুল্লাহ) তার আল হাওয়াদিস ওয়াল বিদায়া কিতাবে যা বলেন তা নিম্নরূপ :

"ইবনু অজ্জাহ যায়িদ ইবনু আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমরা আমাদের কোনো শায়খ ও আমাদের কোনো ফকীহকে শবে বরাতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখিনি এবং তাঁরা মাকহুলের কথাকে কোনো মূল্য দেননি, এমনকি শবে বরাতের অন্যান্য 'আমলের উপর কোনো ফযীলত আছে বলে মনে করেন না।"

ইবনু আবী মুলাইকাকে বলা হয়েছিল যে, যিয়াদ নুমাইরী বলেন যে, শবে বরাতের ফযীলত শবে কদরের ফযীলতের সমান। তা শুনে তিনি বলেন : আমি যদি তাকে বলতে শুনতাম আর আমার হাতে লাঠি থাকতো তবে অবশ্যই তাকে প্রহার করতাম। আর যিয়াদ ছিল একজন গল্পবাজ। এ ব্যাপারে কথা শেষ।

আল্লামা শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) "আল ফাওয়াইদ আলমাজমূয়াহ" কিতাবে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন : "হে 'আলী! যে ব্যক্তি শবে বরাতে একশত রাকআত নামায আদায় করল আর তার প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল ফাতিহাহ্ ও কুলহু আল্লাহু আহাদ দশবার করে পড়ল আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় প্রয়োজন অবশ্যই পূর্ণ করবেন...।" হাদীসটি মওযূ বা জাল। উক্ত হাদীসে বর্ণিত শব্দসমূহে যে সওয়াব হাসিলের উল্লেখ রয়েছে– তাতে কোনো ভালোমন্দের তারতম্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত হাদীসটি মওযূ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। তার রাবীগণও মাজহুল (অজ্ঞাত) আর তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সূত্রই মওযূ বা জাল এবং রাবীগণ মাজহুল। আর তিনি আল মুখতাসার কিতাবে বলেন : শবে বরাতের নামাযের হাদীস বাতিল। ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় 'আলীর হাদীস : "শবে বরাত আসলে তোমরা রাত জাগরণ করো ('ইবাদতে লিপ্ত থাকো) এবং দিনে রোযা রাখো।[২০] বর্ণনাটি যঈফ (দুর্বল) এবং তিনি আল লায়ালি কিতাবে বলেন : শবে বরাতে প্রতি রাকআতে দশবার কুলহু আল্লাহু আহাদসহ একশত রাকআত... এর বড়ো ফযীলত থাকা সত্ত্বেও দলাইমী ও অন্যদের মতে মওযূ বা জাল এবং উক্ত হাদীসের তিনটি সূত্রেরই অধিকাংশ রাবী মাজহুল ও যঈফ। তিনি বলেন : বারো রাকআত ত্রিশবার কুলহু আল্লাহু আহাদসহ আদায়ের হাদীসটি মওযূ।" "১৪ রাকআত-এর হাদীসটিও মওযূ।"

এই হাদীসের মাধ্যমে ফকীহদের এক জামা'আত আকৃষ্ট হয়েছেন যেমন 'আল ইহয়া'-এর লেখক ও অন্যরা এবং অনুরূপ আকৃষ্ট হয়েছেন মুফাস্‌সিরীনে কিরামের কতিপয় ব্যক্তি। অবশ্য শবে বরাত উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় যে নামায প্রচলিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বাতিল মওযূ এবং এটি

[১৯] *সহীহ মুসলিম।*

[২০] *বায়হাক্বী ও সুনান ইবনু মাজাহ্।*

আত্ তিরমিযী'র বর্ণনা– 'আয়িশার হাদীস। নবী (ﷺ)-এর বাকীতে (গোরস্থান) যাওয়া, শবে বরাতের রাতে প্রতিপালকের পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করা এবং তিনি কালব গোত্রের ছাগলের পশমের চেয়েও বেশি লোকের গুনাহ মাফ করবেন এর খেলাফ নয়– এই রাতের মনগড়া নামাযের ক্ষেত্রে 'আয়িশার এই হাদীসও যঈফ তাতে ইনকেতা (রাবীর ধারাবাহিকতাহীন) রয়েছে। অনুরূপভাবে, শবে বরাতের ক্বিয়ামের ব্যাপারে 'আলীর হাদীস যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে, তাও মনগড়া বা জাল।

হাফেয ঈরাকী বলেন : শবে বরাতের নামাযের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে।

ইমাম নওয়াভী মাজমু কিতাবে বলেন : সালাতুর রাগাইব নামে প্রসিদ্ধ নামায (আর তা হলো– রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাতে মাগরিব ও 'ইশার মাঝে বারো রাকআতবিশিষ্ট নামায) এবং শবে বরাতের একশত রাকআত বিশিষ্ট নামায, দু'টি নিকৃষ্টতম বিদ'আত।

এই দুই নামাযের বর্ণনা কূতুল কুলূব ও ইহয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থদ্বয়ে থাকায় এবং এ ক্ষেত্রে বর্ণিত (দুর্বল ও জাল) হাদীস থাকায় আকৃষ্ট হওয়া যাবে না, কেননা তা সম্পূর্ণই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। শায়খ ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনু ইসমাঈল আল মাকদেসী উক্ত দুই নামাযের বৈধতা খণ্ডনে অতি চমৎকার ও উত্তম একটি স্বতন্ত্র বই লিখেছেন। আর এই মাসআলার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য অনেক রয়েছে। তাদের যে সমস্ত বক্তব্য এই মাসআলা সম্পর্কে জেনেছি তা যদি সমস্ত বর্ণনা করতে যাই তবে আমাদের কথা অনেক দীর্ঘায়িত হবে। যা আমরা বর্ণনা করলাম তা সত্যান্বেষীর জন্য আশাকরি নির্ভরযোগ্য ও যথেষ্ট হবে।

যে সমস্ত আয়াত, হাদীস ও উলামায়ে কিরামের বক্তব্য বর্ণিত হলো, সত্যান্বেষীর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় শবে বরাতে নামায ও এ দিনে বিশেষ করে রোযা রাখা বা অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে উদযাপন করা অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের নিকট নিকৃষ্টতম বিদ'আত। পূত-পবিত্র শরিয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই; বরং তা ইসলামের মধ্যে সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে।

অতএব এ বিষয়ে এবং এ ধরনের অন্য মাসআলায় সত্যান্বেষীর জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম"[২১] ও এ ধরনের আয়াতসমূহ এবং নবী (ﷺ)-এর বাণী : "যে আমাদের এ দ্বীনে কোনো নয়া বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত"[২২] এবং এ বিষয়ে যে সব হাদীস এসেছে তা যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "তোমরা জুমু'আর রাত্রিকে অন্যান্য রাতের মধ্যে ক্বিয়ামের জন্য (রাত্রি জাগরণের জন্য) নির্ধারণ করো না, অনুরূপভাবে অন্যান্য দিনের মধ্যে জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারণ করো না, তবে তোমাদের যদি কারো কোনো নির্দিষ্ট রোযা উক্ত দিনে পতিত হয় তা ভিন্ন ব্যাপার।"

অতএব কোনো 'ইবাদতের জন্য যদি কোনো রাত্রিকে নির্ধারণ করা জায়িয থাকত তবে জুমু'আর রাত অবশ্যই অন্যান্য রাতের চেয়ে অগ্রাধিকার পেত, কেননা জুমু'আর দিন সূর্য উদিত হওয়া দিনের সর্বোত্তম দিন। যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু নবী (ﷺ) অন্যান্য রাত্রির মধ্যে জুমু'আর রাত্রিকে 'ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, জুমু'আর রাত ব্যতীত অন্যান্য রাতকে 'ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করা অবশ্যই নিষেধের আওতায়।

অতএব শবে বরাতকে সহীহ দলিল ব্যতীত কোনো 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়িয নয়। পক্ষান্তরে, শবে ক্বদ্‌র ও রামাযানের রাত্রিসমূহ 'ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপনের বৈধতা রয়েছে। নবী (ﷺ) এ ব্যাপারে সজাগ করেছেন এবং উম্মাতকে উক্ত রাত্রি জাগরণে উৎসাহিত করেছেন ও নিজে তা পালন করেছেন। যেমন- সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিমে রয়েছে– নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকীর প্রত্যাশা নিয়ে রামাযানের রাত্রিযাপন করল আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন[২৩] এবং "যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকীর প্রত্যাশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদ্‌র (শবে ক্বদ্‌র) যাপন করল আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন।"[২৪]

তবে শবে বরাত, রজব মাসের প্রথম জুমু'আহ্ ও শবে মি'রাজ যদি কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা কোনো 'ইবাদতের

[২১] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩।*
[২২] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য।*
[২৩] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; সুনান আরবায়াহ।*
[২৪] *সহীহুল বুখারী।*

মাধ্যমে উদযাপন করা শরিয়তসম্মত হতো তবে নবী (ﷺ) অবশ্যই তার নির্দেশনা দিতেন বা নিজে পালন করতেন, আর তিনি যদি তা পালন করতেন তবে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অবশ্যই তা উম্মতদের প্রতি বর্ণনা করতেন এবং এগুলো তাঁরা গোপন করতেন না। তাঁরা হলেন নবীদের পর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের প্রতি রাজি হন এবং তাদেরকে রাজি করেন।

বিগত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ওলামায়ে কিরামের বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাত্রি ও শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে কোনো কিছু সাব্যস্ত নেই। অতএব জানা গেল এগুলো উদযাপন করা ইসলামের নামে নবাবিষ্কৃত বা বিদ'আত। অনুরূপ, কোনো প্রকার 'ইবাদতের মাধ্যমে উভয় রাত্রিকে নির্দিষ্ট করাও জঘন্যতম বিদ'আত।

অনুরূপ ২৭ রজবের রাত্রি সম্পর্কে কতিপয় লোকের ধারণা যে, এটি মি'রাজের রাত। উপরোল্লেখিত প্রমাণপঞ্জির আলোকে উক্ত রাত্রিকে কোনো 'ইবাদতে নির্দিষ্ট করা এবং অনুষ্ঠান পালন করা নাজায়িয, যদি এর তারিখ সঠিকভাবে জানাও যেত। কিন্তু ওলামায়ে কিরামের মতের ভিত্তিতে সহীহ কথা হলো যে, শবে মি'রাজের তারিখ অজ্ঞাত, আর যে ব্যক্তি বলে যে মি'রাজ ২৭ রজব, তার কথা বাতিল ও হাদীসসমূহে তার কোনো ভিত্তি নেই।

এ সম্পর্কে জনৈক মনীষী কতইনা চমৎকার বলেছেন :

وخير الأمور السالفات على الهدي،

وشر الأمور المحدثات البدائع.

সর্বোত্তম ও সঠিক হিদায়াতের উপর ভিত্তি হলো সালাফে সালেহীনের তরীকা, আর যাবতীয় কাজের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো নবাবিষ্কৃত বা বিদ'আতসমূহ।

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও সমস্ত মুসলমানকে সুন্নাতে রাসূল মজবুতভাবে ধারণ করার ও তাঁর প্রতি অটল থাকার এবং সুন্নাত পরিপন্থি বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন, তিনিই তো পরম দাতা-দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। ❑

কবিতা

বাসনার কবর ঘিরে শেয়ালের ডাক

–মোল্লা মাজেদ*

উদ্ধত বাসনার তীব্র কামনা ভরা
চোখ দু'টি লোলুপ নেশায়
ক্ষত-বিক্ষত করে প্রেমিকের মন
ক্ষণেকের মোহে পরে নরক পেশায়।
প্রেমের রসনা ভরা গভীর সাগর
নিমগ্নে নিমজ্জিত কামুক নাগর।
খ্যাতি-যশ সবই ছিল ভরা যৌবন
বিত্ত বৈভব আর সরসিত মন।
নিঃশ্বাসে ছড়িয়ে যায় ফুলের সুবাস
পরশেই আমোদিত চপল বাতাস।
দেখে তার রূপভার পলক বিহীন
অপলক চেয়ে রয় তাই নিশি দিন,
না পাওয়ার ব্যথাটাই মনের হুতাশ।

পৃথিবীর রূপ-রস গন্ধ অপার
যত সুধা প্রশান্তির সবি একাকার
একাকিত্বে এসে যায় হাতে বাসনার।
দর্প ভরে পথ চলে নেই তার শেষ
সবখানে লেলিয়ে দেয় রূপের আবেস
অতৃপ্ত তবুও রয় মনের খায়েস।

তন্দ্রায় ঢুলু -ঢুলু মত্ত মাতাল
প্রমত্ত প্রেমিক দল তারেই ঘিরে
রচেছিল সুখ-স্বর্গ কাল মহাকাল
দেখেছিল প্রাণ ভরে রঙিন স্বপন।
উদ্ধত বাসনার তীব্র কামনা ভরা
মোহনীয় মাদকতার নেই যেন শেষ
অনাসেই ঢলে যেত অজান্তে অগোচরে
আপনার আমিত্বকে করে নিঃশেষ।

রূপের বেসাতি নিয়ে পাপের ছোঁয়াচ পেয়ে
এসে গেল অনেকেই বাসনার জীবনেই
ঘনে এলো গভীর আঁধার
ফিরে চায় যেই দিকে পাক ধরা কবরীকে
দোলায় না বিনুনীতে ধারে নাকো ধার,
নিঃশেষ হয়ে যায় সকল বাহার।

উদ্ধত বাসনার তীব্র কামনা ভরা
রসাত্মক দেহ তার হলো বিমলিন
সুখের পালঙ্ক ফেলে আশ্রিতা মাটির কোলে
সকল বেসাতি আজ মাটিতেই লীন।

যেই দেহ রূপভারে গর্বিত অহংকারে
সেই দেহ তৃপ্ত ভরে কিসের খোরাক?
বাসনার দোসর কেউ থাক বা নাথাক
একবার কান পেতে শুধু শুনে যাক
বাসনার কবর ঘিরে শেয়ালের ডাক।

---

* *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

বিশ্বনবী (ﷺ)-এর সমাজ সংস্কারের রূপরেখা

–কে. এম. আব্দুল জলিল*

ভূমিকা : বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। মহানবী (ﷺ) আরব সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সংস্কার সাধন করেন যার মধ্যে সমাজ সংস্কার অন্যতম। তিনি শতধাবিভক্ত, মারামারি-হানাহানিতে লিপ্ত, দস্যুবৃত্তির পরিপূর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই আরব সমাজকে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সভ্য, আদর্শপূর্ণ ও আলোকিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁরই হাতে গড়া আদর্শবাদ, উন্নত চরিত্রের অধিকারী সাহাবাদের সহযোগিতায় ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে আরবকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ জাতিতে পরিণত করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপি তাঁর সংস্কারসমূহ ছড়িয়ে দিয়ে মহাবিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন নবী (ﷺ)-এর সংস্কারসমূহকে এক অবিস্মরণীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মহানবী (ﷺ)-এর সংস্কার সম্পর্কে বলেছেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।"[২৫]

ঐতিহাসিক উইলিয়ম মুইর যথার্থ বলেছেন,

The Prophet his real greatness a master mind not only his own age but of all ages.

অর্থাৎ- মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগের পরই নয়, সর্বযুগের ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।"

আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে তার হারানো পথ পুনরুদ্ধার করতে, সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে প্রত্যেক জাতির মাঝে তিনি প্রেরণ করেন পথ প্রদর্শন। স্রষ্টা ও মনিব হিসেবে এটিই তার চিরায়ত প্রথা। কাউকে পুনঃ সতর্ক না করে তিনি বান্দাকে শাস্তির মুখোমুখি করেন না। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا﴾

"আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দেয়নি।"[২৬]

প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী, অঞ্চল, ক্বাওম, ভূখণ্ড, ভাষা-ভাষীর জন্য তিনি যুগে যুগে আবশ্যকরুপে সতর্ককারী, হিদায়েতকারী কাউকে না কাউকে প্রেরণ করেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আমি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের চারিত্রিক পূর্ণতা দানের জন্য। এখানেও কোনো সীমানা বা গণ্ডি সীমায়িত হয়নি। অর্থাৎ- মুহাম্মদ (ﷺ) মক্কার না-কি মদিনার, আরবের না-কি আজমের, এশিয়ার না-কি ইউরোপের এটি স্পষ্ট বুঝা না গেলেও কুরআন আমাদের সকল দ্বিধা দূর করে দেয়। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ﴾

"আর আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি সকল বিশ্বের রহমতস্বরুপ।"[২৭] অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا﴾

অর্থাৎ- "আমরা আপনাকে সকল মানুষের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"[২৮]

মুহাম্মদ (ﷺ) বিশেষ কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর নবী নন; বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের, সকল ভাষা-ভাষীর নবী। এই জন্যই তাঁকে বিশ্বনবী বলা হয়। তিনি ছিলেন বিশ্বের কর্ণধারা, মহামানব, বিশ্বজনীন, ম্যাসেঞ্জার অব ওয়ার্ল্ডস, মহান সংস্কারক, মহাজ্ঞানী ইত্যাদি।

সমাজ সংস্কারের নেপথ্যে চাবিকাঠি : মুহাম্মদ (ﷺ)-কে বিশ্বনবী বলে আখ্যায়িত করার সর্বধিক বড়ো কারণের নেপথ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী–

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾

অর্থাৎ- "আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"[২৯]

এ মহান আয়াত এ কথা প্রমাণ করে-এ দুনিয়ায় আর কোন দ্বীনের আগমন, আর কোনো নবীর আবির্ভাব প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত। তদানীন্তন সময়ে আরব বিশ্বে ও তার বাইরে বিবদমান সমাজ কাঠামোর নৈতিক উৎকর্ষ

* *সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[২৫] *সূরা আল আহ্যা-ব : ২১।*

[২৬] *সূরা ইস্‌রা : ১৫।*

[২৭] *সূরা আল আম্বিয়া- : ১০৭।*

[২৮] *সূরা সাবা- : ২৮।*

[২৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩।*

ও পরিগঠনগত পরিবর্তনের যে সুবাতাস ভারী হয় এবং তা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে সত্যিই তা এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। বিশ্বনবী (ﷺ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাপনা আজও প্রযুক্তিক ও আধুনিক বিশ্বকে চোখ ধাধিয়ে দেয়। তার সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন তখনও এবং বর্তমানেও সবাইকে বিস্ময়াবিভূত করে।

মানব মনকে বিশুদ্ধ আক্বিদায় পরিণত করা : রাসূল (ﷺ) একটি উন্নত মানবিক ও নৈতিক সমাজ কাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথমেই তিনি মানব মনের ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ্ দূর করতে সচেষ্ট হন। মানুষের মন ও মানসে যত বিভ্রান্তি, বাতিল 'আক্বিদাহ্, 'আক্বিদাহ্ সংক্রান্ত যাবতীয় ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করতে প্রয়াসী হন। সেজন্য তাঁর প্রচারিত সার্বিক আহ্বানের মৌলিক বিষয় ছিল لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ অর্থাৎ- নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহরই রসূল। এই সার্বজনীন আহ্বানের সূচনাই ছিল নেতিবাচকতা দিয়ে। যার সাথে যুক্ত করা হয়েছে ইলাহ শব্দকে; বরং এটি সমগ্র অশুদ্ধ ও ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ্ মূলোৎপাটনের সূত্রপাত।

নৈতিক সমাজ গঠনে চরিত্রের গুরুত্ব : সমাজের একক যদি ব্যক্তি হয় তাহলে ব্যক্তির পরিশোধনই সমাজ কাঠামোর চেহারা বদলে দিতে সক্ষম। বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ) এ বাস্তব উপলব্ধি হতেই ব্যক্তি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন তার মিশনের সর্বাগ্রে। ব্যক্তি, মন, আত্মা ইত্যাদির শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতার উপর জোর গুরুত্বারোপ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

অর্থাৎ- "সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।"[৩০] আর বিশুদ্ধ আত্মাই হলো পবিত্র ও প্রশান্ত আত্মা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ○ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ﴾

অর্থাৎ- "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভূর পানে ফিরে এসো সন্তুষ্টচিত্তে। আর শামিল হয়ে যাও আমার বান্দার দলে। শেষত প্রবেশ করো জান্নাতে।"[৩১]

[৩০] *সূরা আশ্ শাম্স : ৯-১০।*
[৩১] *সূরা আল ফজ্র : ২৭-৩০।*

এভাবেই তাঁর দাওয়াতি মিশনের বেশিরভাগ সময় অতিক্রান্ত করেন ব্যক্তি চরিত্রের বিন্যাস ও সুসজ্জিতকরণে। একটি সমাজ পরিবর্তনের কী দীর্ঘমেয়াদী অনন্য প্র-পরিকল্পনা ছিল নবী (ﷺ)-এর।

পরকাল ভীতির ভীত মজবুতকরণ : মানব জীবনের চিরন্তন প্রক্রিয়া এমনই যে, সে সর্বদা ভাবে এরপরে কী হবে? এরপরে কি? এই ভাবনা ও বিশ্বাস একজন মানুষকে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ চরিত্রে উর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী করে থাকে। উৎকর্ষ চরিত্রের উর্ধ্বগমন প্রত্যাশা ছিল রাসূল (ﷺ)-এর জীবন আরাধ্য। তাই মানবের ভাবী চিন্তার সফল রূপায়নে তার কর্ম পদ্ধতি ছিল যুগান্তকারী। আল্লাহর বাণীর সর্বত্র ছড়িয়ে ও ছিটিয়ে আছে এই চিন্তার প্রলেপ স্পর্শ। আল কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে–

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর তারা আখিরাত দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী।"[৩২] অন্য আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

﴿بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾

অর্থাৎ- "কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।"[৩৩]

তাক্বওয়াভিত্তিক সমাজব্যবস্থা : আল্লাহ তা'আলা নির্দেশিত, রাসূল (ﷺ) কর্তৃক প্রবর্তিত সমাজের সুখ-শান্তির গোঁড়ার কথা ছিল সমাজের সর্বত্র তাক্বওয়ার পরিপালন ও পরিপোষণ। কারণ একমাত্র তাক্বওয়াই পারে একজন মানুষকে প্রকাশ্যে-প্রচ্ছন্নে, আলোতে-অন্ধকারে, দিবসে-রাত্রিতে, শয়নে-জাগরণে স্বচ্ছ জীবনের মালিক বানাতে। মানব জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে তাক্বওয়া। তাক্বওয়া জীবনকে সুন্দর করে, সুশোভিত করে, মর্যাদাশীল করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করে।"[৩৪] তাক্বওয়াই মূলতঃ ঝামেলা মুক্তির পথ উন্মোচক। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

[৩২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪।*
[৩৩] *সূরা আল আ'লা : ১৬-১৭।*
[৩৪] *সূরা আল হুজুরাত : ১৩।*

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ খুলে দেন।"[৩৫] মুত্তাক্বিরাই সর্বদা সফলতার আস্বাদন প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ○ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই সচেতন ব্যক্তিদের জন্য আছে সাফল্য, উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ।"[৩৬]

তাক্বওয়াই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমাজ ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির মূলোৎপাটন করেছিল। ইতিহাসের মহান শিক্ষা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়-দুর্নীতির প্রকাশ্য চিহ্ন সে সমাজে ছিল না। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ- সমাজ হয়েছিল দুর্নীতিমুক্ত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাজনীতির সফলতার স্মারকস্তম্ভ ছিল তাক্বওয়ার সম্প্রসারণ।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার মূলোৎপাটন : মূল্যবোধ, মনুষত্ববোধ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতার ধারণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও আন্তরিক বাস্তবায়নের ফলে অল্পদিনের ব্যবধানে আরবের ঘোলাটে রাজনীতি স্বচ্ছ রাজনীতির উৎসে পরিণত হয়। জোর যার মুল্লুক তার, রক্তের বদলা কেবলই রক্ত এসব শ্লোগান সকল মুসলিম ভাই-ভাই, অন্যের উপকারে ব্রত যে সেই শ্রেষ্ঠ সন্তান, অন্যায় বধ সর্বদা অবৈধ ইত্যাদি শ্লোগান রূপ নেয়। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমাজ থেকে সন্ত্রাস বিলুপ্ত করে তথায় সৌহার্দ্যের বীজ বপন করেন। সমাজকে মানব বসবাসের উপযুক্ত করতে সকল ইতিবাচক পদ্ধতির বাস্তবায়ন করেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে। এ কাজের অধীনে নারীর চালচলনের নিশ্চয়তা, জিম্মির অধিকার, অন্যধর্মাবলম্বীর পাওনা, যাবতীয় উগ্রতার মূলোচ্ছেদ এবং সকল অমানবিকতার শেকড় উৎপাটন করেন। সত্যিই তার সমাজ সংস্কারের নেপথ্যে এই কাজসমূহ সামাজিক সুস্থতায় এ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করেছে।

অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : অপরাধ শব্দটির সমার্থক দোষ, ত্রুটি, আইনবিরুদ্ধ কাজ, দণ্ডনীয় কর্ম, পাপ, অধর্ম, অন্যায়, অসঙ্গতি, দুষ্কর্ম, দুর্নীতি, কুনীতি, কুকর্ম, অপকর্ম ইত্যাদি। এটি মানুষের ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত দু'ভাবেই সংঘটিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে অসৎকর্ম ও সৎকর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। কিন্তু কোনো একটি করতে বাধ্য করেননি। তাই মানুষ সৎকর্মের জন্য পুরুষ্কার এবং অসৎকর্মের জন্য শাস্তির যোগ্য। অপরাধ কর্মের মধ্যে রয়েছে কিছু ছোট আবার কিছু বড়ো। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে যিনা, ব্যাভিচার, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, মাদকাশক্তি, জুয়া, দুর্নীতি, প্রতারণা, কাউকে ঠকানো, জুলুম করা, নির্যাতন করা ইত্যাদি। এগুলো নিঃসন্দেহে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। শান্তি, নিরাপত্তা, কলুষতামুক্ত সমাজ বিনির্মাণে অপরাধ দমনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মনে রাখতে হবে, অপরাধ প্রতিরোধে শাস্তিই একমাত্র হাতিয়ার নয়। এজন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অপরাধের কুপ্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতাও সৃষ্টি করতে হবে।

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের নীতিমালা : ইসলাম মানব জাতিকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি। সাথে সাথে সমাজ প্রতিষ্ঠার নীতিমালাও প্রদান করেছে। ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো এ সমাজে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই, উঁচু-নীচু কোনো গোত্র ও বর্ণ বৈষম্য এখানে নেই। এ সমাজে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় তার আচার-আচরণ, শরিয়তের অনুশাসন অনুশীলন প্রভৃতির মাধ্যমে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অমুসলিম জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে কোন বৈষম্য আরোপ করা হয় না। ইসলামী সমাজে মুসলিম অমুসলিম একে অপরের সাহায্য সহযোগিতায় পরস্পর মিলে-মিশে শান্তিতে বসবাস করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। সর্বোপরি ইসলাম আদর্শ ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার সকল ন্যায়-নীতি উপহার দিয়েছে। একজন সাধারণ মানুষের প্রতি ও ইসলামী সমাজে বেইনসাফী করা হয় না। তাছাড়া, সমাজের প্রতিটি মানুষের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মসজিদভিত্তিক হওয়ায় এর কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত।

তাওহীদী চেতনায় মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মপন্থা : মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনাদর্শ যেমন অতুলনীয় ও অনুপম তাঁর শিক্ষা ও বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর অবদানও তেমনই অভূতপূর্ব ও অসাধারণ। তিনি সেই অসীম অনন্ত বিশ্বনিয়ন্তার নিকট মাথা নত করবার জন্য সমগ্র বিশ্বমানবকে আহ্বান করেছেন। তাঁর এই জীবন্ত একত্ববাদ সমস্ত কল্পিত

[৩৫] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২।*
[৩৬] *সূরা আন্ নাবা- : ৩১-৩২।*

শক্তির পূজাকে অস্বীকার করেছে; বহুত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, অবতারবাদ ও জড়বাদ সমস্তকে অস্বীকার করে তিনি সেই অসীম সত্তাকে সমগ্র বিশ্বে চির বিরাজমান দেখিয়েছেন। সেদিন মানুষ মানুষকে মহান আল্লাহর আসনে বসিয়ে নিজের সত্তা বিসর্জন দিয়েছিলো, নিজের মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করেছিলো; স্বকপোলকল্পিত শক্তির নিকট, নিজের হাতে গড়া পুতুলের কাছে ভিখারীর মতো আত্মসমার্পণ করে নিজের আত্মার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছিল। মুহাম্মদ (ﷺ) এ সমস্ত তিমিরজাল ছিন্নভিন্ন করে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, মানুষ যতই মহৎ ও উন্নত হোক না কেন, যতই শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হোক না কেন, সে কখনও অনন্ত শক্তি, অনন্ত চেতনা, অনন্ত মহিমা ও গরিমাকে তার শান্ত জীবনে পূর্ণভাবে বিকাশ করতে পারে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

"যারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে ঘর বানায়। আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত।"[৩৭]

সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে মুহাম্মদ (ﷺ) : বিশ্ব-সভ্যতায় সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে মুহাম্মদ (ﷺ) শ্রেষ্ঠ অবদানের অন্যতম। তিনি মহান আল্লাহকে সমগ্র বিশ্বের প্রভু বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে সাম্যের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। সালাত, সাওম ও যাকাত প্রভৃতি অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সাম্যকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বছরে হজ্জের মধ্য দিয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। যাকাত ধনীর ধনে নিধনের অধিকার দিয়ে এবং ধনীর ধনকে সমাজে বিতরণের ব্যবস্থা করে এক অর্থনৈতিক সাম্যের সৃষ্টি করেছে; ধনীর সঞ্চয়ের তৃষ্ণা ও দরিদ্রের দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার এবং ধন ও শ্রমের চিরন্তন কলহ মিটিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়েছে। মুসলমানদের সালাত বা 'ইবাদত ও সাম্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। মুসলমানগণ দল বেঁধে এক হয়ে একই মহান আল্লাহর আরাধনা করে। জুম'আর দিনে গ্রামে গ্রামে মসজিদে আসে সকল মুসলমান অনন্ত, এক অদ্বিতীয় প্রভুর নিকট লুটায়ে পড়ে। মুহাম্মদ (ﷺ) জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য মুছে ফেলে সমগ্র মানবজাতিকে এক সমাজভুক্ত করবার কেবল জীবন্ত প্রেরণাই দেননি, বাস্তব জগতে কোটি কোটি মানুষকে এই সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। কুরআনের ঘোষণা :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

অর্থাৎ- "মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও।"[৩৮]

পরিশেষে বলা যায়, আজকের বিশ্বসমাজে মানব জাতির অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে সর্বাধিক আলোচিত মহামানব মুহাম্মদ (ﷺ)। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই আজ যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের কথা স্মরণ করে, তেমনি তাঁর কৃতিত্ব ও অবদানের কথাও বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ মহান আল্লাহর বাণী আল কুরআনের আলো যেমন নিঃশেষ হবার নয়, তেমনি এই কুরআনের বাহক বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর চরিত্র, তাঁর আদর্শ, তাঁর ভূমিকা ও তাঁর অবদানের কথাও কিয়ামত পর্যন্ত মানব সমাজের জীবন পথে আলোকবর্তিকার কাজ করে যাবে। বিশ্বমানবতার মহান মুক্তিকে সামনে রেখে যে মহান বিশ্বনেতার আগমন তার দেখানো পথেই মিলতে পারে কেবল মুক্তির রক্তিম সূর্যোদয়ের প্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। জীবন পরিচালনায় যিনি ছিলেন নির্মোহ, সংসার নির্বাহে ছিলেন সুবিচারী, সমাজ সালিশীতে সুবিবেচক, বক্তব্য উপস্থাপনায় বিনয়ী ও প্রতিবাদী, যুদ্ধ শৃংখলায় মানবতাবাদী, আদর্শিক বন্ধুত্বে রহমদিল, ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে আস্থার প্রতিক, চিন্তা-চেতনায় বিশুদ্ধ ও মানবিক, চরিত্র বিবেচনায় সম্পূর্ণ নিস্কলুষ, অঙ্গীকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মিথ্যা অশ্লীলতা থেকে অনেক দূরে। এমনি আরো অসংখ্য ও অগণিত বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা যাবে। আজকের অশান্ত পৃথিবীকে শান্তিময় করবার জন্য রাসূল (ﷺ) যে মহান দাওয়াই দিয়ে গিয়েছেন তার যথাযথ প্রয়োগ আজ সময়ের দাবি। ❑

[৩৭] *সূরা আল 'আনকাবূত : ১।*

[৩৮] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১০।*

মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণের ঘটনা

–মো. গিয়াসুদ্দীন★

মি'রাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের এক অনন্য মুজিযাহ্। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

"মহিমাময় মহাপবিত্র সত্তা তিনি, যিনি আপন বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিক আমি বরকত দিয়ে ভরে রেখেছি। যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।"[৩৯]

মি'রাজ বিশ্বনবী (ﷺ)-এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর চলছিল চরম নির্যাতন। সে সময় এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার এ দ্বীনকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন। এ মি'রাজ রজনীতেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ 'ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য হয়।

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা : আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? তিনি বললেন, মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ো।[৪০]

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর মসজিদে আকসা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) নির্মাণ করেছেন।[৪১]

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হারামকেও মসজিদে হারাম বলে বলা হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রিওয়ায়াতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রিওয়ায়াতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত : আল্লাহ তা'আলা বলেন– ﴿بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ অর্থাৎ- "যার চারদিক আমি বরকত দিয়ে রেখেছি"। এখানে حَوْلَ বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে– আল্লাহ তা'আলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূ-পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।[৪২]

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ : ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব নবীদের কিবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। পার্থিব বরকত হচ্ছে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরনা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যিই বিরল। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রিওয়ায়াতে আল্লাহ বলেছেন, "হে শাম ভূমি! জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব।"[৪৩]

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : মালিক ইবনু সা'সা'আহ্ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী (ﷺ) তাকে সে রাতে বর্ণনা করেন, আমি হাতীমে কা'বায়, অন্য বর্ণনায় বলেছেন– 'হিজরে' শায়িত ছিলাম। এ সময় আমার নিকটে একজন দূত জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) আসেন, যিনি আমার নাভি হতে তলপেট পর্যন্ত চিরে ফেলেন। অন্য বর্ণনামতে, গলদেশ থেকে নাভির নীচ বা তলপেট পর্যন্ত চিরে আমার কলব বের করে ফেললেন। অতঃপর স্বর্ণের একটি বড়ো পাত্র আনা হলো, যা ঈমান দ্বারা ভর্তি ছিল, তাতে আমার কলব ধৌত করা হলো। অতঃপর তা (ঈমান দ্বারা) পূর্ণ করা হলো। তারপর তা যথাস্থানে রেখে দেয়া হলো। তারপর খচ্চর থেকে ছোট এবং গাধা থেকে বড়ো একটি সাদা রঙের চতুষ্পদ জন্তু আমার নিকটে নিয়ে আসা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, জারূদ ইবনু আবী সুবরা তাকে বললেন, হে আবূ হাম্‌যাহ্! তা কি বুরাক?

★ *জুরাইন, ঢাকা।*

[৩৯] *সূরা বানী ইসরাঈল : ১।*

[৪০] *সহীহ মুসলিম।*

[৪১] *তাফসীরে কুরতুবী- ৪/১২৭ পৃ.।*

[৪২] *তাফসীরে রূহুল-মা'আনী।*

[৪৩] *তাফসীরে কুরতুবী।*

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ! (তা এমন বাহন ছিল যেটি দৃষ্টির শেষ প্রান্তে পা রাখত)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর আমাকে সেটির উপর উঠানো হলো। জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে পৃথিবীর আকাশের কাছে উপস্থিত হয়ে দ্বার রক্ষককে দ্বার খুলতে বললেন। দ্বার রক্ষক তাঁকে বললেন, আপনি কে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে? জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ! তখন (দ্বার রক্ষকের পক্ষ হতে) বলা হলো, তাঁর জন্য মুবারকবাদ যিনি তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কতই না উত্তম! তারপর দরজা খুলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি প্রথম আকাশে উপস্থিত হয়ে তথায় আদম আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, পুণ্যবান সন্তান এবং পুণ্যবান নবীর জন্য মারহাবা। তারপর জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশের নিকট উপস্থিত হয়ে দ্বার রক্ষককে দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো– আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তারপর প্রশ্ন করা হলো– আপনাকে কি তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন বলা হলো, তাঁর জন্য মারহাবা, যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি খুবই উত্তম। তারপর দরজা খুলে দিলেন। আমি দ্বিতীয় আকাশে প্রবেশ করে তথায় ইয়াহ্‌ইয়া এবং ‘ঈসা আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম (তাঁরা উভয়ে খালাত ভাই সম্পর্কীয়)। তারপর জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, ইনি ইয়াহ্‌ইয়া এবং ইনি ‘ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম জানালে তাঁরা সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর জন্য মারহাবা। অতঃপর জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশের নিকট গিয়ে দ্বার রক্ষককে দরজা খুলতে বললে প্রশ্ন করা হলো– আপনি কে? জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো– আপনার সাথে কে আছেন? জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তারপর জিজ্ঞেস করা হলো– আপনাকে তাঁর নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে নাকি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন দ্বার রক্ষক বললেন, তাঁর জন্য মারহাবা। যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি বড়ই উত্তম। তারপর দরজা খোলা হলে আমি তথায় ঢুকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, ইনি ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর জন্য মারহাবা। অতঃপর জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চতুর্থ আকাশের নিকটে উপস্থিত হয়ে দ্বার রক্ষককে দরজা খুলতে বললে, প্রশ্ন করা হলো, আপনি কে? জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। তারপর বলা হলো– আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর নিকটে কি আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো– তাঁর জন্য মারহাবা। যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি খুবই উত্তম। তারপর দরজা খোলা হলে আমি ভেতরে ঢুকে ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি ইদ্রীস আলাইহিস সালাম। আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর জন্য মারহাবা। তারপর জিব্‌রাঈল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে নিয়ে উপরে উঠলেন এবং পঞ্চম আকাশের নিকট উপস্থিত হয়ে দ্বার রক্ষককে দরজা খুলতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো– আপনার সাথে কে আছেন? জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো– (আপনাকে) তাঁর নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন বলা হলো– তাঁর জন্য মারহাবা এবং যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি বড়ই উত্তম। অতঃপর আমি ভেতরে ঢুকে হারূন আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম পরিচয় করে দিয়ে বললেন, ইনি হারূন আলাইহিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর জন্য মারহাবা। অতঃপর জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে আরো উপরে উঠলেন। এমন কি তিনি ষষ্ঠ আকাশের নিকটে উপস্থিত হয়ে দ্বার রক্ষককে দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো– আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। পুনরায় বলা হলো, আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন দ্বার রক্ষক বললেন, তাঁর জন্য মারহাবা এবং যিনি তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তিনি খুবই উত্তম। আমি ষষ্ঠ আকাশে প্রবেশ করে মূসা আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলে তিনি উত্তর দিলেন, অতঃপর বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর জন্য মারহাবা। অতঃপর আমি তাঁকে অতিক্রম করে চলে যাওয়ার সময় তিনি কেঁদে ফেলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো– আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার পরে এমন এক আদম সন্তানকে নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে, যার

উম্মাত আমার উম্মাতদের থেকে অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে আরো উপরে উঠলেন, এমনকি তিনি সপ্তম আকাশের নিকটে উপস্থিত হয়ে দ্বার রক্ষককে দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো– আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো– আপনার সাথে কে আছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)? তারপর জিজ্ঞেস করা হলো– তাঁর নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন দ্বার রক্ষক বললেন, তাঁর জন্য মারহাবা এবং যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি বড়ই উত্তম। আমি ভেতরে প্রবেশ করে, ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে তথায় দেখতে পেলাম। জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আপনার (ঊর্ধ্বতন পিতা) আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি উত্তর দিলেন এবং বললেন, পুণ্যবান ছেলে ও পুণ্যবান নবীর জন্য মারহাবা। অতঃপর আমাকে ঊর্ধ্বে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহার' দিকে আরোহণ করানো হলো। আমি তখন একটি বৃক্ষ দেখতে পেলাম, যার ফলগুলো হিজ্‌র এলাকায় বড়ো বড়ো মটকার ন্যায়, খুবই সুন্দর এবং পাতাগুলো হাতীর কানের মতো বড়ো বড়ো। তখন জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, এটাই হলো 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা'। তথায় আমি চারটি নহর (নদী) দেখতে পেলাম, যার দু'টি গোপনীয় আর দু'টি দৃশ্যমান। তখন আমি জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে বললাম, হে ভাই জিব্‌রাঈল! এ দু'টি কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য দু'টি হলো জান্নাতের নহর আর প্রকাশ্য দু'টি হলো নীল ও ফুরাত নদী। অতঃপর আমার সামনে 'বাইতুল মা'মুর' উপস্থাপন করা হলো। তারপর আমার কাছে, মদ, দুধ এবং মধুর একেকটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। আমি দুধের পাত্রটি হাতে নিলে আমাকে বলা হলো, এটাই হলো ফিত্‌রাত (দ্বীন ইসলাম)। আর আপনি এবং আপনার অনুসারীরা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতঃপর আমার উপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফর্‌য করা হলো। আমি ফিরে চললাম। ফেরার পথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আপনাকে কি কাজের আদেশ করা হয়েছে? বললাম, আমাকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনার অনুসারীগণ প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে সক্ষম হবে না। আমি আপনার পূর্বেই লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি। অর্থাৎ- আমি বানী ইসরাঈলকে এ ব্যাপারে কঠিনভাবে পরীক্ষা করেছি। তাই আপনি প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং তাঁর নিকটে আপনার অনুসারীদের জন্য আরো সংক্ষেপ করার অনুরোধ করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি মহান আল্লাহর নিকটে ফিরে গেলাম (এবং সংক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানালাম)। আমার উম্মাতের উপর থেকে দশ ওয়াক্ত কমানো হলো। আমি পুনরায় মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটে ফিরে আসলাম। তিনি পুনরায় পূর্ববৎ পরামর্শ প্রদান করলে আমি পুনরায় মহান আল্লাহর সকাশে গেলে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটে আবার প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি আবারো পূর্বের ন্যায় বললে আমি আবার মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। আমি পুনরায় মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকটে উপস্থিত হলে তিনি পূর্ববৎ পরামর্শ দেন। আমি আবারও মহান আল্লাহর দরবারে ফিরে আসলে আমাকে প্রতিদিন দশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করেন। আমি আবার মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি আবারও পূর্বানুরূপ বললে আমি পুনরায় মহান আল্লাহর নিকটে প্রত্যাবর্তন করলাম। এবার আমাকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। তখন আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি আমাকে বললেন, এবার কত ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম, আমাকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। এবারো মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনার অনুসারীগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে সক্ষম হবে না। আমি আপনার আগে বানী ইসরাঈলকে কঠিনভাবে পরীক্ষা করেছি। তাই আপনার প্রভুর নিকটে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর নিকটে আপনার অনুসারীদের জন্য আরো সংক্ষেপ করার আবেদন জানান। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকটে আবেদন করেছিলাম, আমি এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে লজ্জাবোধ করছি। তাই আমি এর উপরই সন্তুষ্ট হয়ে মেনে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, অতঃপর আমি যখন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমাকে কোনো আহ্বানকারী অর্থাৎ- আল্লাহ বললেন, "আমি আমার ফর্‌য পূর্ণ করেছি এবং আমার বান্দাদের উপর সংক্ষিপ্ত করেছি।"[৪৪]

মসজিদুল হারাম হতে মসজিদে আকসা ভ্রমণের পথে শিক্ষণীয় ঘটনা : ইমাম বায্‌যার ও আবূ ইয়া'লা এবং ইবনু জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনু নাসর মারঅযী তাঁর কিতাবুস সালাতে আর ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদোয়াহে প্রমুখ আবূ হুরাইরার বর্ণনায় মি'রাজের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলেন, বুরাকে চড়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা থেকে সফর শুরু করেন তখন তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে যান, যারা একদিনে চাষ করছে এবং ঐ একদিনেই ফসল কাটছে। যখন তারা তা কাটছে তখনই তা আবার তৈরিও হয়ে যাচ্ছে। তাই নবী (ﷺ) বলেন, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা মহান

[৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮৮৭।*

আল্লাহর রাহে জিহাদকারী। এদের নেকীগুলো সাতশো গুণ করা হচ্ছে। আর এরা যেসব জিনিস খরচ করেছে তারই বদলা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিচ্ছেন।

তারপর তিনি (ﷺ) একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন যাদের মাথাগুলো পাথর দিয়ে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে। যখনই তা চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখনই তা আবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ কাজ থেকে তাদের বিরাম নেই। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, এরা কারা হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, এরা তারা, যারা নামাযের পরোয়া করতো না।

তারপর তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের সামনে একটি হাঁড়িতে রান্না করা গোশ্ত এবং অন্য হাঁড়িতে পচা গোশ্ত রয়েছে। অতঃপর তারা পচা মাংসটা খাচ্ছে এবং রান্না পবিত্র মাংসটা ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বললাম, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই ব্যক্তি যার কাছে হালাল (বিয়ে করা) স্ত্রী আছে। তথাপি সে নাপাক নারীর কাছে আসে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তেমনি সেই নারী যার কাছে হালাল স্বামী আছে। অথচ সে নাপাক পুরুষের কাছে আসে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তারপর তিনি একটি পাথরের কাছে এলেন, যা পথের উপরেই ছিল। অতঃপর ওর পাশ দিয়ে যে কাপড়ই অতিক্রম করছিল সেটাকে তা ছিঁড়ে ফেলছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বলেন, এটা আপনার উম্মতের সেই সম্প্রদায়গুলোর উদাহরণ যারা রাস্তায় বসে, অতঃপর তারা ডাকাতি ও রাহাজানি করে।

তারপর তিনি একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যারা কাঠের একটা বিরাট বোঝা জড়ো করে রেখেছে, যা সে বইতে পারছে না। অথচ তার উপরে সে আরো বোঝা চাপাচ্ছে। তাই দেখে তিনি (ﷺ) বললেন, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বলেন, এরা আপনার উম্মতের এমন লোক, যাদের কাছে লোকেদের আমানত জমা রয়েছে। সেগুলোকে সে আদায় করতে পারছে না। অথচ সে ওর উপরে আরো বোঝা চাপাচ্ছে।

তারপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের জিভ ও ঠোঁটগুলো জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। তা যখনই কাটা হচ্ছে তখনই সেটা আবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যেমন তা ছিল। তা থেকে তাদের বিরাম দেয়া হচ্ছে না। তিনি (ﷺ) বললেন, এরা কারা, হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, এরা ফিতনাবাজ বক্তা।

তারপর তিনি একটি ছোট্ট পাথরের কাছে এলেন, যার ভেতর থেকে একটা বিরাট বড়ো বলদ বের হচ্ছে। তারপর ঐ বলদটি ওর মধ্যে ফিরে যেতে চাইছে সেখান থেকে সে বের হয়েছিল। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই দেখে তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বলেন, এই ব্যক্তিটি বড়ো বড়ো কথা বলছে। যার জন্য সে লজ্জিতও হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে সে ফেরত নিতে পারছে না।

তারপর তিনি (ﷺ) একটি পাহাড়ি উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ঠান্ডা সুগন্ধি এবং মেশকের খোশবু পেলেন। আর একটি আওয়াযও শুনতে পেলেন। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা জান্নাতের ধ্বনি। সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনি তা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন? এমতাবস্থায় অনেক হয়ে গেছে আমার কামরাগুলো ও রকমারী রেশমী সাজ-সজ্জা এবং আমার লোটা ও বাহনাদি আর আমার মধু ও পানি এবং আমার দুধ ও মদ প্রভৃতি। তাই আপনি আমাকে আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য আছে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী এবং ঈমানদার নর ও ঈমানদার নারী। তখন জান্নাত বললো, আমি সন্তুষ্ট।

তারপর তিনি (ﷺ) আর একটি উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ভয়ংকর আওয়াজ শুনলেন ও দুর্গন্ধময় গন্ধ পেলেন। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কী? হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, এটা জাহান্নামের ধ্বনি। সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে তা দিন যার ওয়াদা আমার সাথে আপনি করেছেন। কারণ, অনেক হয়ে গেছে আমার শিকল ও বেড়ি এবং শাস্তি। আর আমার গভীরতা আরো গভীর হয়েছে এবং আমার তাপটা প্রচণ্ড হয়েছে। তাই আপনি আমাকে দেয়া আপনার ওয়াদাটা পূরণ করুন। তিনি বললেন, তোমার জন্য রয়েছে প্রত্যেক নাপাক নর ও নারী এবং প্রত্যেক দাম্ভিকতাকারী, যে হিসাব-নিকাশের দিনটাকে বিশ্বাস করে না। তখন জাহান্নাম বললো, আমি সন্তুষ্ট। তারপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে এলেন। অতঃপর বুরাকটাকে একটি পাথরে বেঁধে মসজিদে ঢুকলেন।[৪৫]

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. রাসূল (ﷺ)-কে সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।

২. বিভিন্ন আসমানে রাসূল (ﷺ) নবীদের সাথে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করেছেন।

৩. এ রাতে উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে।

৪. জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা সাতশোগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিবেন।

৫. সালাতের প্রতি যত্নবান নাহলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৭. প্রত্যেক নাপাক নর ও নারী এবং প্রত্যেক দাম্ভিকতাকারী, যে হিসাব-নিকাশের দিনটাকে বিশ্বাস করে না তার জন্য জাহান্নাম। ❑

[৪৫] *তাফসীরে দুররে মানসূর- ৩/২৬৯ পৃ.।*

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা

–মাক্বসুদুর রহমান★

ভালোবাসা পবিত্র ও পুণ্যময়। এ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে ভালোবাসা তথা দয়া-মায়া-মমতা আছে। নির্দোষ ও পরিশীলিত ভালোবাসা আমাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ মসৃণ করে। আল্লাহ-রাসূলের প্রতি সবিশেষ ভালোবাসা ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ، مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ".

"তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পায় (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সকল বস্তু হতে অধিক প্রিয়; (২) যে একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য কোনো বান্দাকে ভালোবাসে এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা কুফ্‌র হতে মুক্তি প্রদানের পর যে কুফ্‌র-এ প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতোই অপছন্দ করে।"[৪৬]

পরম শ্রদ্ধা, গভীর ভালোবাসা আর বিপুল মমতার এক চমৎকার সংমিশ্রণের সমন্বিত রূপ হচ্ছে– 'মহব্বত' নামের এ আরবি অভিব্যক্তিটি।

মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

বিভীষিকাময় রোজ কিয়ামতে যখন সূর্য মাথার হাতখানেক ওপর থেকে অগ্নি বর্ষণ করতে থাকবে, প্রখর তাপে মাথার মগজ গলে পড়বে, তখন মহান আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়াতলে যারা মহান আল্লাহকে ভালোবাসে তারা স্থান পাবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : «أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ».

"নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন কোথায় আমার মর্যাদার প্রতি মহব্বতকারীরা, আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার আপন ছায়াতলে ছায়া দান করব।"[৪৭]

অন্য বর্ণনায় সাত শ্রেণির লোক স্থান পাবে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ওই দুই ব্যক্তি যারা শুধু আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে, তাঁর জন্য মিলিত হয় আবার তাঁর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

"سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".

"যে দিন মহান আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণির মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক মহান আল্লাহর 'ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে। (৪) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে– আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সাদাক্বাহ্ করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি

★ *দাওরায়ে হাদীস (মুমতায), বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (ফার্স্ট ক্লাস)। শিক্ষক- মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্, রানীবাজার, রাজশাহী এবং গবেষণা সহকারী- ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রানীবাজার, রাজশাহী।*

[৪৬] *বুখারী- অধ্যায় : কুফ্‌রীতে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, হা. ২১, ১৬, ই. ফা. বাং, হা. ২০, আ. প্র., হা. ২০; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬২৪; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৯৮৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০৩৩, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮।*

[৪৭] *মুসলিম- অধ্যায় : মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ফযীলত, হা. ২৫৬৬; সুনান আদ্ দারেমী- হা. ২৭৯৯; মিশকাত- হা. ৫০০৬।*

নির্জনে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে মহান আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।"[৪৮]

রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা

ঈমানের আলোকে আলোকিত প্রত্যেক মু'মিনের অন্তর আলোড়িত হয়, শিহরিত হয়, মনে আনন্দের সুর বাজতে থাকে যখন প্রিয় নবী ﷺ-এর নাম উচ্চারিত হয়, তাঁর জীবন-চরিত আলোচিত হয় কিংবা তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী পাঠ করা হয়। সত্যের দীক্ষায় দীক্ষিত অন্তর তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হয়, উম্মতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসায় আপ্লুত হয়। তাঁর একনিষ্ঠ দিক নির্দেশনায় পথ খুঁজে পায় পথহারা বিভ্রান্ত মানব সমাজ, আর দুর্বল চিত্তের লোকেরা ফিরে পায় মনোবল। মানবতার কল্যাণকামীরূপেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন এ বিপর্যস্ত দুনিয়ায়। সত্যিই তিনি তাঁর যুগের যমীনকে মুক্ত করেছেন অশান্তির বেড়াজাল হতে, উদ্ধার করেছেন অজ্ঞানতা ও মুর্খতার নিকষ অন্ধকার হতে। তাইতো জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে বরণ করে নিয়েছে মানবতার বন্ধুরূপে।

সত্যের এহেন প্রতিষ্ঠাতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও ব্যবহারিক সৌন্দর্যের এমন রূপকারের প্রতি একটু বেশি পরিমাণে ভালোবাসা পোষণ করা এবং তাঁর প্রতি পাহাড়সম প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখা মু'মিন জীবনে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ইসলামী শরিয়ত নবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বত পোষণকে ওয়াজিব ও অপরিহার্য বলে আখ্যায়িত করেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

"(হে নবী!) তুমি বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"[৪৯]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার আগেই প্রিয় নবী ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে চরম ভালোবাসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

«فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ».

"সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র হই।"[৫০]

অপর বর্ণনায় রয়েছে– আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ».

"তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।"[৫১]

পরিশেষে এ কথা বলে শেষ করবো যে, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যেন আমাদের সবাইকে জানা, বুঝা ও 'আমল করার মাধ্যমে সত্যিকারভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনকরতঃ আখিরাতের অপার সুখ ও শান্তিময় জীবনের অন্বেষায় সচেষ্ট হই। আমাদের চলমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা যেন আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি –আমীন। ❑

---

[৪৮] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ডান হাতে সাদাক্বাহ্ প্রদান করা, হা. ১৪২৩, ৬৬০, ৬৮০৬, ই. ফা. বাং, হা. ১৩৩৭, আ. প্র., হা. ১৩৩১; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : গোপনে দান করার ফযীলত, হা. ১০৩১, জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৯১; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫৩৮০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৭০১।*

[৪৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩১।*

[৫০] *বুখারী- অধ্যায় : আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, হা. ১৪, ই. ফা. বাং, হা. ১৩, আ. প্র., হা. ১৩; মুসলিম- অধ্যায় : রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসার আবশ্যকতা, হা. ৪৪, আন্ নাসায়ী- হা. ৫০১৩; ইবনু মাজাহ্- হা. ৬৭; মিশকাত- হা. ৬।*

[৫১] *বুখারী- অধ্যায় : মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, হা. ১৫, ই. ফা. বাং, হা. ১৪, আ. প্র., হা. ১৪; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসার আবশ্যকতা, হা. ৪৪; মুসানাদে আহমাদ- হা. ১২৮১৪।*

কিয়ামতের ভয়ংকর প্রকম্পন

–ডা. সুলতান আহমদ*

মহান আল্লাহর বাণী : "যখন প্রবল কম্পনে যমীন প্রকম্পিত করা হবে। আর যমীন তার ভার বের করে দেবে। আর মানুষ বলবে, এর কী হলো? সেদিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে কারণ আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়, কেউ অনুপরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অনুপরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে।"[৫২]

'যালযালাহু' মানে হচ্ছে– প্রচণ্ডভাবে জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া, ভূকম্পিত হওয়া। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এক. মরা মানুষ মাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে এবং যাবতীয় মৃতকে বের করে হাশ্‌রের মাঠের দিকে চালিত করবে। মানুষের শরীরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। এই বিষয়টি অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে–

"আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।"[৫৩]

দুই. এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হবে না; বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণের যে স্তূপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে। পরবর্তী বাক্যটিতে এ কথারই প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে– যমীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে।

তিন. কোনো কোনো মুফাস্‌সির এর তৃতীয় একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে– সোনা, রুপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তূপও সেদিন যমীন উগলে দেবে।[৫৪] আর যদি দুনিয়ার জীবনের শেষভাগে কিয়ামতের আলামত হিসেবে এ সম্পদ বের করা বুঝায় তবে এতদসংক্রান্ত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এত বড়ো অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না।[৫৫]

মানুষ অর্থ প্রত্যেকটি মানুষ হতে পারে। কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পাবার সাথে সাথেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হবে যে, এসব কি হচ্ছে? এটা যে হাশ্‌রের দিন একথা সে বুঝতে পারবে। আবার মানুষ অর্থ আখেরাত অস্বীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করতো তা তার সামনে ঘটে যেতে থাকবে এবং সে এসব দেখে অবাক ও পেরেশান হবে। তবে ঈমানদারদের মনে এ ধরনের বিস্ময় ও পেরেশানি থাকবে না। কারণ তখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয় অনুযায়ীই সবকিছু হতে থাকবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীরা বলবে, "কে আমাদের শয়নাগার থেকে আমাদের উঠালো?" এর জবাব আসবে, "এটি সেই জিনিস যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর পাঠানো রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।"[৫৬]

যমীন কি জানিয়ে দেবে এ নিয়ে মুফাসসেরীনদের মধ্যে কয়েকটি মত রয়েছে। সম্ভবত সব কয়টি মতই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে।

এক. ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, এর অর্থ, যমীন তার থেকে যা যা বের করে দিলো (সম্পদরাজি) তা জানিয়ে দিবে। এর সমর্থনে একটি হাদীসে এসেছে, "কোনো মানুষের জীবন যদি কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে অবসান হওয়ার কথা থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য সেখানে যাওয়ার একটি প্রয়োজন তৈরি করে দেন। তারপর যখন সে স্থানে পৌঁছে তখন তাকে মৃত্যু দেয়া হয়। তারপর যমীন কিয়ামতের দিন বলবে, হে রব! এটা তুমি আমার কাছে আমানত রেখেছিলে।"[৫৭]

দুই. ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আগের আয়াতে যে বলা হয়েছে মানুষ প্রশ্ন করবে, 'যমীনের কি হলো'? এ জওয়াব যমীনই দিবে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

---

* *উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সদস্য সচিব, আহবায়ক কমিটি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখা।*

[৫২] *সূরা আয্ যিলযাল : ১-৮।*

[৫৩] *সূরা আল ইন্‌শিক্বা-ক্ব : ৩-৪।*

[৫৪] *আদ্‌ওয়াউল বায়ান।*

[৫৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০১৩।*

[৫৬] *সূরা ইয়া-সীন : ৫২।*

[৫৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৬৩।*

তিন. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এর অর্থ, যমীন তার মধ্যে কৃত ভালো-মন্দ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দাখিল করবে। যমীনের ওপর যা কিছু ঘটে গেছে তার সবকিছু সে কিয়ামতের দিন বলে দেবে।[৫৮]

এর অর্থ, মানুষ সেদিন হাশ্‌রের মাঠ থেকে তাদের 'আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; তাদের কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ যাবে জাহান্নামে।[৫৯] এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিগত হাজার হাজার বছরে সমস্ত মানুষ যে যেখানে মরেছিল সেখান থেকে অর্থাৎ- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থেকে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন- অন্যত্র বলা হয়েছে, "যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে এসে যাবে।[৬০]

অর্থাৎ- তাদের 'আমল তাদেরকে দেখানো হবে। প্রত্যেকে দুনিয়ায় কি কাজ করে এসেছে তা তাকে বলা হবে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাফের মু'মিন, সৎকর্মশীল ও ফাসেক, আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও নাফরমান সবাইকে অবশ্যই তাদের 'আমলনামা দেয়া হবে।[৬১]

এ আয়াতে খায়ের বলে শরিয়তসম্মত সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোনো সৎকর্মই মহান আল্লাহর কাছে সৎকর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎকর্ম আখেরাতে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎকর্মের ফল আখেরাতে পাওয়া জরুরি। কোনো সৎকর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যতবড়ো গুনাহগারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই আখেরাতে তার কোনো সৎকর্মই থাকবে না।

প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যই তার হিসাব হবে এবং তা কোনোক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোনো ছোট সৎকাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে মহান আল্লাহর কাছে একটি অনেক বড়ো সৎকাজ গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত; কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গুনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গুনাহের স্তূপ জমে উঠতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো –তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই হোক না কেন"।[৬২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন : "কোনো সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোনো পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাই হয়।"[৬৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে মুসলিম মেয়েরা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর বাড়িতে কোনো জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।"[৬৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যত্র বলেন, "হে 'আয়িশাহ্! যেসব গুনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ মহান আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৬৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, "সাবধান, ছোট গুনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।"[৬৬]

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্বওয়া অবলম্বন করো নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।"[৬৭]

হাদীসে এসেছে– সফর অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উচ্চৈঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম তার আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন : এই আয়াতে উল্লেখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন দিন হবে তোমরা জানো কি? সাহাবায়ে কিরাম বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সম্বোধন করে বললেন : যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করবেন : কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বললেন : এই সময়ে ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন : তোমরা নিশ্চিত থাকো। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং

---

[৫৮] *কুরতুবী।*
[৫৯] *জালালাইন, মুয়াস্‌সার, সা'দী।*
[৬০] *সূরা আন্ নাবা : ১৮।*
[৬১] *সূরা আল হা-ক্বক্কাহ্ : ১৯ ও ২৫; সূরা আল ইনশিক্বা-ক্ব : ৭-১০।*
[৬২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫৪০।*
[৬৩] *মুসনাদে আহমাদ- ৫/৬৩।*
[৬৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৩০।*
[৬৫] *আহমাদ- ৬/৭০, ৫/১৩৩; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৪৩।*
[৬৬] *মুসনাদে আহমাদ- ১/৪০২।*
[৬৭] *সূরা আল হাজ্জ : ১।*

একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। কোনো কোনো রিওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়।[৬৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : "এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছে করেন তারা ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।"[৬৯] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কিয়ামতের দু'টি পর্যায় রয়েছে– **এক.** ইস্রাফিল কর্তৃক প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। ঐ ফুঁক দেয়া মাত্রই সবকিছু কম্পিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে মহা ধ্বংসের কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। **দুই.** ইস্রাফিল কর্তৃক দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। ঐ ফুঁক দেয়ার সাথে সমস্ত সৃষ্টি মহান আল্লাহর সামনে নীত হবে। তখন হাশ্রের মাঠে সবাই জমায়েত হবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভূকম্পন কখন হবে অর্থাৎ- কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন : কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের প্রাথমিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে বসতকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। যেমন- "যখন শিঙ্গায় এক ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙে দেয়া হবে তখন সে বিরাট ঘটনাটি ঘটে যাবে।"[৭০] "যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো?"[৭১] "যেদিন প্রকম্পনের একটি ঝট্কা একেবারে নাড়িয়ে দেবে এবং এরপর আসবে দ্বিতীয় ঝট্কা। সেদিন অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং দৃষ্টি ভীতবিহ্বল হবে।"[৭২] "যে দিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুঁড়ো হয়ে ধূলির মতো উড়তে থাকবে।"[৭৩] "যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদেরকে বুড়া করে দেবে এবং যার প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে?"[৭৪] এ মতটি বেশ কিছু তাবে'য়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে, এখানে হাশ্রের মাঠে যখন একত্রিত করা হবে তখনকার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে যখন তার সন্তানদের থেকে জাহান্নামীদের কে আলাদা করতে বলবেন, তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে।[৭৫] আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসেও প্রমাণিত হয় যে, ভূকম্পন হাশ্র-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। আর আয়াতের তাফসীরে এটাই সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। তবে কোনো কোনো সত্যনিষ্ঠ আলেম বলেন : উভয় উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশ্র-নশরের পরে হওয়া বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দু'টিই উদ্দেশ্য হতে পারে; কারণ দু'টিই ভয়াবহ ব্যাপার।

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, মারযায়াত এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন কার্যত সে দুধ পান করাতে থাকে এবং শিশু তার স্তন মুখের মধ্যে নিয়ে থাকে।[৭৬]

কাজেই এখানে যে কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে, যখন কিয়ামতের সে কম্পন শুরু হবে, মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে করাতে ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি হলো, একথা কোনো মায়ের মনেও থাকবে না।[৭৭]

পক্ষান্তরে যদি এ ঘটনা হাশ্র-নশরের পরে হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা কারো কারো মতে এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। তারা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর কথা চিন্তাও করবে না।[৭৮]

কুরআন হাদীসের আলোকে আমাদের শতভাগ সতর্ক হওয়া অপরিহার্য। জীবন জিন্দেগী মহান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করার এখনই সময়। জানিনা মহান আল্লাহর হুকুম কখন আমাদের ওপর বর্তে যাবে। কখন কোন হুকুমে চিরবিদায় হব। আল্লাহ তা'আলার কাছে কি জবাব দেব? প্রস্তুতি নেয়ার সময় এখনই। ❑

---

[৬৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩১৬৯; মুসনাদে আহমাদ- ৪/৪৩৫; মুস্তাদরাকে হাকিম- ১/২৮, সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৭৩৫৪।*

[৬৯] *সূরা আয্ যুমার : ৬৮।*

[৭০] *সূরা আল হা-ক্কাহ্ : ১৩-১৫।*

[৭১] *সূরা আয্ যিলযা-ল : ১-৩।*

[৭২] *সূরা আন্ না-যি'আ-ত : ৫-৯।*

[৭৩] *সূরা আল আল ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৪-৬।*

[৭৪] *সূরা আল মুযযাম্মিল : ১৭-১৮।*

[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৭০; সহীহ মুসলিম- হা. ২২২।*

[৭৬] *সুনান ইবনু কাসীর।*

[৭৭] *সুনান ইবনু কাসীর; ফাতহুল কাদীর।*

[৭৮] *কুরতুবী।*

তুরস্ক-সিরিয়ার ভূমিকম্প আমাদের সতর্কবার্তা

–আব্দুল মুমিন*

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি রাত ১টা ১৭ মিনিটে (গ্রিনিচ মান সময়ে) ৭ দশমিক ৮ এবং পরদিন সকাল ১০টা ২৪ মিনিটে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার দু'টি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে তুরস্ক ও সিরিয়ার এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে। এতে কয়েক হাজার ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এর মধ্যে এমন অনেক নতুন বানানো অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকও রয়েছে, যেগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৭ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত হয়েছে। যার মধ্যে শুধু তুরস্কেরই প্রায় ৩০ হাজার। অগণিত মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে আছে। তাদের উদ্ধারের সময়-সুযোগও এখন ফুরিয়ে গেছে। শুক্রবারে একেবারে রাতের প্রথমদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেন্টিনেল-ওয়ান-এ স্যাটেলাইটটি তুরস্কের সাত শত কিলোমিটার উপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছিল। সেই স্যাটেলাইটে ধরা পরে ভূমিকম্পের ফলে ভূমি বেঁকে গেছে, ধসে পড়েছে, এমনকি কোথাও কোথাও ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। দু'টি ভূমিকম্পেই ভূমি নড়েছিল বামদিক বরাবর। এর মানে হচ্ছে বিচ্যুতি রেখার যেদিকেই কেউ থাকুক অন্যদিকের ভূমি বাঁ দিকে সরে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় প্রায় একমিটার পর্যন্ত সরে গেছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এ ফাটল রেখা মানববসতির ভেতর দিয়ে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় একেবারে বিল্ডিং-এর ভিতর দিয়ে গেছে। সংবাদ মাধ্যমগুলো সবসময় ভূমিকম্পের 'এপিসেন্টার' দেখানো হয়, যেন এটার উৎস একটাই, বোমার মতো। কিন্তু আসলে সব ভূমিকম্পেরই সৃষ্টি হয় বিচ্যুতি রেখা বরাবর ঘষাঘষির কারণে। ভূমিকম্প যত বড়ো হয়, তত বেশি বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বিচ্যুতি রেখা বরাবর ফাটল তৈরি হয়।

তুরস্কের ভূমিকম্পে বিপুল হতাহতের এ ঘটনায় বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। তুরস্ক-সিরিয়ার মতো বাংলাদেশেও ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা রয়েছে। সিলেট সীমান্তে সক্রিয় ডাউকি ফল্টের অবস্থান ও টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টের অবস্থান এবং উত্তর-পূর্বে সীমান্তসংলগ্ন ইন্ডিয়ান প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থল হওয়ায় বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ১৮৭০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বড়ো আকারের বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে এ অঞ্চলে। পরবর্তী সময়ে ছোট ছোট কিছু ভূমিকম্প হলেও বড়ো মাত্রার কোনো ভূমিকম্প হয়নি। রাজধানী ঢাকা শহরের নিচে যদি মাত্র পাঁচ মাত্রার একটি ভূমিকম্পও হয় তাহলে তাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। আর ঢাকার কাছাকাছি উত্তর-পূর্বকোণে ডাউকি ফল্ট; এখানে সংকোচনের হার হচ্ছে প্রতি একশত বছরে একমিটার। গত ৫শ থেকে ৬শ বছরের মধ্যে বড়ো ধরনের ভূমিকম্পের কোনো রেকর্ড নেই। তার মানে এই ফল্টটি ৫-৬ মিটার চ্যুতি ঘটানোর শক্তি অর্জন করেছে। যদি রিকটার স্কেলে প্রকাশ করা হয় তাহলে সে ৭ দশমিক ৫ থেকে ৮ দশমিক শূণ্য মাত্রার একটি ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। ২০০৩ সাল থেকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা কুষ্টিয়ার সৈয়দ হুমায়ুন আখতার (জন্ম : ১৯৫৫) বলেন– ভূতাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এর মধ্যে একটি হলো– ইন্ডিয়া প্লেট। এর পূর্বদিকে দ্বিতীয়টি বার্মা প্লেট এবং তৃতীয়টি উত্তরের এশিয়া প্লেট। ইন্ডিয়া ও বার্মা প্লেটের সংযোগস্থল বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ হাওর হয়ে মেঘনা দিয়ে বঙ্গোপসাগর হয়ে সুমাত্রা পর্যন্ত চলে গেছে। প্লেটের সংযোগস্থলে ৮০০ থেকে ১০০০ বছর আগে ভূমিকম্প হয়েছিল। তারপর আর কোনো বড়ো ধরনের ভূমিকম্প হয়নি। ফলে এই দীর্ঘ সময়ে এই অংশে যে পরিমাণ শক্তি জমা হয়ে আছে সেটি যদি একসঙ্গে বের হয়, তাহলে ৮ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, এই শক্তি একদিন না একদিন বের হবেই। সম্পূর্ণ শক্তি একসাথে বের হতে পারে আবার আংশিকও বের হতে পারে। বের হবে– এটি নিশ্চিত। তবে ঠিক কোন সময়ে বের হবে তা বলতে পারব না। আর এই ফল্ট থেকে ঢাকার অবস্থান দেড়শ কিলোমিটারের মধ্যে। এই ফল্টে এই মাত্রার একটি ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকার ভয়ংকর অবস্থা হবে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে অসংখ্য স্থাপনা। আর নিহতের সংখ্যা যে কত হতে পারে তা তো কল্পনাও করা যায় না।

তুরস্ক-সিরিয়ার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের উচিত– অবিলম্বে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের দুর্বল অবকাঠামোর ভবনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া। নতুন ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে কি-না, তার তদারকি নিশ্চিত করা। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা ও চিকিৎসার সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিসহ পরিষেবাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে ভূমিকম্পসহনীয় করে গড়ে তোলা। এবং মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য ও সতর্ক করে বারংবার রেডিও, টিভি ও ইলেক্ট্রনিকস্ মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা। সর্বোপরি এমন ভয়ানক বিপর্যয় থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে পানাহ্ চাওয়া। তিনিই পারেন কেবল আমাদেরকে অনুরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া থেকে হিফাজত করতে। হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমার কাছেই সকল বিপর্যয় থেকে পানাহ্ চাই। তোমার কাছেই কেবল সাহায্য চাই। তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো –আমীন। ❑

* *খতিব, চিনাদিপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ, বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।*

সাহাবা-চরিত

‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)

(৬৪৪-৬৫৬ খ্রি./২৪-৩৫ হি.)

–আবু সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০২]

‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)’র এক যুগের শাসনামলে খিলাফতের সম্প্রসারণ চমকপ্রদ অধ্যায়ের সূচনা করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিজয়লাভ, পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলে বিজিত অঞ্চলসমূহে বিদ্রোহ দমন তাঁর খিলাফত সংহতকরণের শক্তিমত্তা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাঁর বিজয়াভিযানসমূহকে আমরা দু’ভাবে বিবেচনা করতে পারি। **প্রথমতঃ** সম্পূর্ণ নতুন এলাকা খিলাফতের অন্তর্ভুক্তিকরণ, **দ্বিতীয়তঃ** বিদ্রোহ প্রবন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিদ্রোহীদের নির্মূলকরণ ও শাসনব্যবস্থা সংহতকরণ। নিম্নে উভয় ধরনের বিজয়াভিযানের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো–

পূর্বাঞ্চল বিজয় : ‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদেগরদ হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিদ্রোহ শুরু করে। খলিফার আদেশে বসরার শাসনকর্তা ‘আব্দুল্লাহ ইবনু আমীর তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে নিশাপুর, মার্ভ, বলখ, তাবারিস্তান প্রভৃতি বিদ্রোহী অঞ্চলসমূহ দখল করে পারস্যরাজ্যের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দেন। ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াজদেগরদ করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে। এরপর মুসলিম সৈন্যদল কিরমান মাকরান, সিজিস্তান, হিরাত, কাবুল, গজনী ও খাওয়ারেজম প্রভৃতি স্থানে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)-এর খিলাফতে মুসলিম আধিপত্য শুধু প্রাচ্যেই বিস্তার লাভ করেনি; পাশ্চাত্যেও মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল।

পশ্চিমাঞ্চল বিজয় : মিসরে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)’র ইন্তেকালের পর রোমান সম্রাট এটি পুনরুদ্ধারের জন্য ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এক বিরাট নৌবাহিনী প্রেরণ করে আলেকজান্দ্রিয়া পুনর্দখল করে নেয়। মিসরের শাসনকর্তা ‘আম্‌র ইবনু আল ‘আস রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাঁর অসাধারণ রণনৈপূণ্যে রোমান নৌবাহিনী পরাভূত হয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধার করেন। বীরত্বসূচক এ বিজয়াভিযানের নায়ক ‘আম্‌র ইবনু আল ‘আস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)-কে কৌশলগত কারণে অপসারণ করে খলিফা তার দুধভ্রাতা ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সা‘আদ ইবনে আবী সারহে (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)-কে মিসরের গভর্নর পদে নিয়োগ দেন।

‘আম্‌র (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)’র অপসারণে উল্লসিত ত্রিপলীর রোমান শাসনকর্তা ও সেনাপতি গ্রেগরী আবার মিসরে হানা দিতে শুরু করেন। ফলে আব্দুল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং কার্থেজে রোমানদের সাথে মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ১,২০,০০০ রোমান সৈন্য থাকলেও তারা পরাজিত হয় এবং তাদের উদ্ধত শাসনকর্তা ও সেনাপতি নিহত হয়। ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপোলী মুসলমানদের করতলগত হয়। অন্যদিকে রোমান নৌবহর সিরিয়ার উপকূলে নানাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। নৌপথে রোমানদের মোকাবেলা করবার উদ্দেশ্যে খলিফার পরামর্শক্রমে মিসরের শাসনকর্তা ‘আব্দুল্লাহ এবং সিরিয়ার শাসনকর্তা মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) মুসলিম নৌবাহিনী গঠনে তৎপর হন। নবগঠিত নৌবাহিনীর অভিনব যুদ্ধ কৌশল ও ক্ষিপ্রতার ফলে মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)’র নেতৃত্বে সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকৃত হয়। অতঃপর মুসলমানরা রোডস ও সিসিলী দ্বীপে সফলতার সাথে আক্রমণ পরিচালনা করেন।

ইতোমধ্যে ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়া মাইনর থেকে রোমানরা এক বিরাট বাহিনীসহ সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। সিরিয়ার প্রাদেশিক গভর্ণর মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) খলিফা প্রেরিত ৮,০০০ সৈন্য ও সিরিয়ার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী রোমানদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী আর্মেনিয়া, তাজিকিস্তান ও তিফলিস অধিকার করে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীর এবং উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পদানত হয়। দ্বিতীয় দফা সাইপ্রাস অভিযানের সময় রোমান নৌবাহিনীর সাথে মুসলমানদের অন্ততঃ পঞ্চাশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতিটি যুদ্ধেই মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। একই বছরে মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) রোম ভূখণ্ডের হিসনুর রুয়াত নামক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

দখল করেন। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সময় পুনর্বার খোরসান অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। খলিফার নির্দেশে আহনাফ ইবনু কায়েসের নেতৃত্বে সকল অভিযান পরিচালিত হয় এবং অনায়াসে বিদ্রোহ দমিত হয়।

তৃতীয় খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র রাজত্বকালে ছিল নানা কারণে বিড়ম্বনাপূর্ণ ও লোমহর্ষক। ইসলামের শত্রুরা তখনও সজাগ ও তৎপর ছিল। ইসলাম ও ইসলামী খিলাফতকে কলংকিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার নানা অভিসন্ধি অব্যাহত ছিল। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট বারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম কয়েক বছর সুখ্যাতির সাথে ভালোভাবেই অতিবাহিত হয়। অগ্রগতি, রাজ্যবিস্তার, বিদ্রোহ দমন, পূনর্দখল, পুনরুদ্ধারসহ সুশাসনে রাজ্যময় আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাঁর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর সুখ্যাতিতে ভরপুর ছিল। কিন্তু পরবর্তী ছয় বছর অশান্তি, বিদ্রোহ ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল। যা পরবর্তীকালে চরম আকার ধারণ করে। এ ধারাবাহিকতায় ইতিহাসের মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হয়; 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। তাঁর হত্যার কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। তবে আয্ যুহরী'র ভাষায়, "'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশদের মধ্যে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়ভাজন ছিলেন।" সেখানে তো এমনি ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা অবতারণা হওয়ার কথা নয়। তবে তিনি ইসলামের চিরশত্রুদের নিশানায় ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বর ও 'ইবাদতগুযার ও সরল হওয়ায় অনেকে সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সুবিধাবাদীদের অভিযোগ যতই শুনেছিলেন এবং তার প্রতিকার করেছিলেন, ততই তারা অবাধ্য এবং কলহ প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তার এই সরলতা, ভালোবাসা ও ক্ষমাজনিত দুর্বলতা একদিকে যেমন তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল অন্যদিকে তেমনি ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। দুর্ধর্ষ আরবগণকে দমন করার জন্য 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মতো কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অত্যধিক বয়স হেতু 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মধ্যে সে ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার অভাব দেখা দেয়। খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতের ৮ম বর্ষে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক একজন ইয়াহূদী বসরার গভর্ণর 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। ইবনু সাবা'র অন্তরের লুক্কায়িত দুরভিসন্ধিই ইসলামের কাঠামোকে আঘাত করে খলিফা 'উসমানের হত্যার পথকে সুগম করে তোলে। ইবনু সাবা অতি সন্তর্পনে তার মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরলমতি খলিফা তা অনুধাবনের পূর্বে ইবনু সাবা মর্মন্তুদ পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তোলে। সে প্রথমতঃ খলিফার নিয়োজিত শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় এবং সিদ্ধান্ত দেয় যে, খিলাফত কিংবা খিলাফতের কোনো উইং কর্তৃক বাঁধা প্রাপ্ত হলে খলিফার বিরুদ্ধেও প্রচারণা চালাতে হবে। মিসরে গমন করে ইবনু সাবা প্রচার করতে থাকে যে, 'খলিফা 'উসমান রাজ্য অপহারক পাত্র। অবৈধভাবে খিলাফত লাভ করায় তাঁর শাসনে অবৈধাচরণ প্রবেশ করেছে। আরো প্রকাশ করে যে, তাঁর নিয়োজিত শাসকবর্গ অত্যাচারী এবং নাস্তিক, তাদের শাসনে দেশ হতে সত্য এবং ন্যায়নীতি দূরীভূত হয়েছে।'

ইবনু সাবা'র এ সকল বিষময় প্রচারণা মিসর, কুফা এবং বসরার স্বার্থান্বেষী জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল। ইবনু সাবা সিরিয়া ছাড়া সকল প্রদেশেই গমন করতে পেরেছিল। খলিফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সময় মুসলমানের সংখ্যা আরবের বাহিরে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই নবদীক্ষিত ব্যক্তিরা ইসলামের প্রবীন শিষ্যমণ্ডলীর সাথে ইসলামের বিধান মতে সমমর্যাদা ও সমানাধিকার লাভ করে। কিন্তু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রিয় শিষ্যবৃন্দ ইসলামের প্রতি যতটুকু অনুরাগী ছিলেন নবদীক্ষিত শিষ্যগণ ততটুকু ছিল না; বরং ইসলাম প্রদত্ত বাকস্বাধীনতা এবং ক্ষমতার সুযোগ ঐ সকল স্বার্থান্বেষী ইবনু সাবার মতবাদে প্রভাবান্বিত হয়ে খলিফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে। ইবনু সাবার প্রচারণাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বেদুঈনদের মধ্যেও অসন্তোষের বীজ ছড়ানো হয়। আরব বেদুঈনদের বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, ইসলামের গৌরবময় প্রসারে বেদুঈনদেরও অবদান রয়েছে। অথচ খিলাফতের উচ্চ পদগুলো কুরায়েশগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে। এই অসত্য প্রচারণার দ্বারা বেদুঈনদেরকে অস্থির করে তোলে। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনীতেও অনুরূপ অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে সেনা ছাউনিতেও বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে বেদুঈনরা বেজায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতে এমন কি 'উসমানী

খিলাফতের প্রথম দিকে এই অসন্তোষের চিহ্ন থাকলেও তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ইবনু সাবার প্ররোচনায় ঐক্য দারুনভাবে বিঘ্নিত হয়। বৃদ্ধ খলিফার পক্ষে শত চেষ্টা সত্ত্বেও অসন্তোষ নিরাময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করে পরিস্থিতি বেসামাল করে তোলে। **অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ :**

১. স্বজনপ্রীতি; **২.** কুরআন মাজীদ দগ্ধীভূতকরণ; **৩.** সরকারি চারণভূমি নিজ কাজে ব্যবহার; **৪.** আবূ যর আল গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্বাসন; **৫.** কাবাগৃহ সম্প্রসারণ; **৬.** বায়তুল মালের অর্থ আত্মীয়-স্বজনকে দান ও **৭.** 'ইবাদত প্রসঙ্গ। **৮.** মারওয়ানের কুটকৌশল; **৯.** কতিপয় অপ্রচলিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড রহিতকরণ; **১০.** মদিনার মসজিদ সংস্কার; **১১.** হজ্জের রীতিনীতি প্রসঙ্গ; **১২.** বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ; **১৩.** বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ; **১৪.** 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র অনুরোধ উপেক্ষা; **১৫.** তাবুর ব্যবহার; **১৬.** হাকাম ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান; **১৭.** ঘোড়ার উপর যাকাত প্রচলন।

ঐতিহাসিকদের অনুমান নির্ভর অভিযোগসমূহের অন্যতম হলো স্বজনপ্রীতি। খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ আরব বেদুঈন এবং অনারব মুসলমানদের অভিযোগ যে, খলিফা রাসূল (ﷺ)-এর ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের অপসারণ করে স্বীয় গোত্রীয় এবং আত্মীয়-স্বজনকে বিভিন্ন সরকারি পদে নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক প্রফেসর ফিলিপ-কে হিট্টি (History of the Arabs, 1950), সৈয়দ আমীর আলী (History of the Saracens, 1951), উইলিয়াম মুইর (Annals of the early Caliphate, 1923), আলফ্রেড ভন ক্রেমার (Culturgeschichte des orients unter den Chalifen, 1875-1877, 2 vols) ও আবুল হাসান 'আলী ইবনু আল হুসাইন আল মাসুদী (কিতাব আল মুরূজ আল যাহাব ওয়া মা'দান আল জাওহার, ১৮৬১-১৮৭৭) প্রমুখ এ মতের সমর্থক। তাঁরা মনে করেন যে, খলিফা 'উসমান তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে এবং উমাইয়া বংশের লোকজনকে সাম্রাজ্যের সকল প্রকার উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন এবং সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। কুফা, বসরা এবং মিসরের লোকেরা এ ব্যাপারে খলিফার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং যেসব পদ থেকে যাদেরকে অপসারণ করে নতুন লোক নিয়োগ করেছিলেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

কুফার গভর্ণর নিয়োগ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র অন্তিমকালীন ওসিয়ত অনুযায়ী 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুগীরার পরিবর্তে সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাসকে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে সা'আদ কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছুটা ভুল হলে খলিফা নিজেই সা'আদকে অপসারণ করেন। সে পদে ওয়ালিদ ইবনু আবী ওয়াক্কাসকে কুফার শাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। ঘটনাটি ৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ওয়ালিদ ছিলেন খলিফার দুধ ভাই। কিন্তু ওয়ালিদ যখন মদ্যপায়ী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন তখন তাঁকে পদচ্যুত ও ইসলামের বিধান মতে বেত্রাঘাত করেন। ওয়ালিদের পর সা'ঈদ আল আসকে খলিফা কুফার গভর্ণর নিয়োগ করেন। কাকতালীয়ভাবে তিনিও খলিফার আত্মীয় ছিলেন। সে কারণে খলিফা কুফাবাসীর বিরাগভাজন হন।

বসরার শাসক নিয়োগ : ৩০ হিজরিতে সামান্য অপরাধের জন্য আবূ মূসা আল আসারীকে বসরার গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করে যুবক 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমীরকে বসরার শাসক নিয়োগ করেন। 'আব্দুল্লাহ সন্দেহাতীতভাবে সুযোগ্য শাসক ছিলেন তথাপি তিনি খলিফার পিতৃব্যপুত্র ছিলেন মর্মে বিদ্রোহীরা তা সুনজরে গ্রহণ করেনি।

মিসরের গভর্ণরের অপসারণ : মিসর বিজয়ী 'আম্র ইবনু আল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সময় ৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরের গভর্ণর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মিসরের রাজস্ব কর্মকর্তার বিরোধ দেখা দিলে খলিফা 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পদচ্যুত করে তাঁর দুধ ভাই 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিসরের গভর্ণর নিয়োগ করেন। তিনি অতীব যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা ও বর্হিদেশীয় আক্রমণ প্রতিহত করলেও বিদ্রোহীরা তার অপসারণ দাবি করে। গোলযোগ নিরসনের অভিপ্রায়ে খলিফা 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে অপসারণ করে মুহম্মদ ইবনু আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিসরের খলিফা নিয়োগ করেন।

সিরিয়ার গভর্ণর : সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সময় উক্ত পদে বহাল ছিলেন। মু'আবিয়াহ্ একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। যেহেতু তিনি খলিফার আত্মীয় ছিলেন সেহেতু বিদ্রোহীরা এ ব্যাপারেও খলিফাকে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

ক্বাসাসুল হাদীস

নেক ‘আমলের ওসিলা দিয়ে দু‘আ করা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

নিজের সৎ কর্মের ওসিলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করা মুস্তাহাব। যেমন- এভাবে বলা, “হে আল্লাহ! তুমি আমার সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সাদাক্বাহ্, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ ইত্যাদি নেক ‘আমলের ওসিলায় আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে সুস্থ করো ইত্যাদি। এটা জায়িয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নের হাদীস হতে–

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমাদের পূর্বযুগের লোকদের মাঝে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির কবলে পড়লো। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিলো। তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ! আল্লাহর শপথ! এখন সত্য ব্যতীত আর কিছুই তোমাদেরকে রেহাই দিতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সে জিনিসের ওসিলায় দু‘আ করা দরকার, যে ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দু‘আ করল, হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জানো যে, আমার একজন চাকর ছিল। সে এক ফারাক চালের বদলে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে চলে গিয়েছিল এবং মজুরিও নেয়নি। আমি তার মজুরি দিয়ে কিছু একটা করতে ইচ্ছা করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে তার বদলে আমি একটি গাভী ক্রয় করলাম। অনেক দিন পর সে মজুরটি আমার কাছে এসে তার মজুরি দাবি করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীগুলোর দিকে তাকাও এবং তা তাড়িয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিলো, ঠাট্টা করবেন না, আমার তো আপনার নিকট মাত্র এক ফারাক চাল পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীগুলো নিয়ে যাও। কারণ (তোমার) সেই এক ফারাক দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বদলে এটি ক্রয় করা হয়েছে। তখন সে গাভীগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি মনে করো তা আমি একমাত্র তোমার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি কিছুটা সরে গেল। দ্বিতীয় যুবক দু‘আ করল, হে আল্লাহ! তোমার ভালো করে জানা আছে যে, আমার মা-বাপ খুব বুড়ো ছিলেন। আমি প্রত্যেক রাত্রে তাঁদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে তাঁদের নিকট যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি বিলম্ব করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় ছটফট করছে। কিন্তু আমি আমার মা-বাপকে দুধ পান না করানো পর্যন্ত আমার (ক্ষুধায় কাতর) ছেলেমেয়েকে দুধ পান করাইনি। কারণ তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানোটা আমি ভালো মনে করিনি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভালো লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়েই খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) সকাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের জাগার অপেক্ষাই করেছিলাম। যদি তুমি জেনে থাকো যে, আমি এটা করেছি একমাত্র তোমারই ভয়ে তাহলে আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আকাশ দেখতে পেল। সর্বশেষ এক যুবক দু‘আ করল, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সঙ্গে (যৌন মিলনের) ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশত দিনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাজী হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা অর্জনে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার কাছে আসলাম এবং এ একশ’ দিনার তাকে দিয়ে দিলাম। তখন সে নিজেই নিজেকে আমার কাছে সোপর্দ করল। আমি যখন তার দু’পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখনি সে বলে উঠল, মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং (শরিয়তের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ব্যতীত আমার সতীত্বকে নষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিলাম এবং একশত দিনারও ত্যাগ করেছিলাম। তুমি যদি জানো যে, আমি প্রকৃতই তোমার ভয়ে তা করেছি, তাহলে তুমি আমাদের হতে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের (গুহার মুখ) থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা বেরিয়ে আসল।[৭৯]

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৭৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৬৫।*

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আর মহান আল্লাহর নির্দেশিত নেক 'আমলের মাধ্যমে তাঁর কাছে ওসিলা দেয়া ও তাঁর অভিমুখী হওয়া; গুহাতে আশ্রয় নেয়া ঐ তিন ব্যক্তির দু'আর মতো যারা তাদের নেক 'আমল দিয়ে, নবী ও নেককারদের দু'আ ও শাফা'আত দিয়ে ওসিলা করে। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই; বরং এটি মহান আল্লাহর এ বাণীতে আদেশকৃত ওসিলা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন : "হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহ কে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা অনুসন্ধান করো।"[৮০]

আল্লাহ আরো বলেছেন, "তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের ওসিলা সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে এবং তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।"[৮১]

মহান আল্লাহর কাছে ওসিলা সন্ধান করা অর্থাৎ- যেটার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে ও নিকটে পৌঁছা যাবে; সেটি কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর 'ইবাদত, আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ভিত্তিতে হোক কিংবা তাঁকে ডাকা, তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে হোক।"[৮২]

নেক 'আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে ওসিলা দেয়া এটি ঐ নেক 'আমলের সওয়াব কমাবে না; চাই সেটা কোন দুনিয়াবী বিষয় হাসিলের জন্য ওসিলা দেয়া হোক কিংবা আখিরাতের বিষয় হাসিলের জন্য ওসিলা দেয়া হোক। কেননা সেটি একটি নেক 'আমল; যা নৈকট্য হিসেবে পালিত হয়েছে, এর মাধ্যমে দুনিয়াবী কিছুকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সৎ 'আমলের বিনিময়ে বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

২. মজুর তার মজুরি যথাসময়ে না নিলে পরে যদি সে আসে তাহলে তাকে অবশ্যই তা দিতে হবে। আর উত্তম হলো তার মজুরি যদি বর্ধিত হয়ে থাকে সবটুকু ফেরত দেওয়া।

৩. আল্লাহ তা'আলার পরেই পিতা মাতার হক্বের ব্যাপারে খেয়াল রাখা।

৪. মহান আল্লাহর ভয় যার মধ্যে রয়েছে সে কখনো যেনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হবে না। ❑

[৮০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩৫।*
[৮১] *সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল : ৫৭।*
[৮২] *ইক্বতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম- ২/৩১২।*

দু'আর আবেদন

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তারের সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া কনিষ্ঠ কন্যা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার মিরপুরের একটি প্রাইভেট শিশু হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছে। তিনি সকল মুসলিমকে তার কন্যা সন্তানের জন্য দু'আর আবেদন জানিয়েছেন। মহান আরশের অধিপতি তাকে পূর্ণ সুস্থতাসহ বরকতময় হায়াত দান করুন- আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

০১. খুলনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি মুহাম্মদ মঈনুল ইসলামের জ্যেষ্ঠ সহদর, রূপসা উপজেলার নারকেলি চাঁদপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদের সভাপতি নজরুল ইসলাম শেখ গত ২০ ডিসেম্বর'২২ মঙ্গলবার বার্ধক্যে উপনীত হয়ে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। খুলনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা জুলফিকার আলী জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনসহ সকল মুসলিমকে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

০২. সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি আব্দুল আজিজ মোন্ডল (৭৪) গত ১০ ফেব্রুয়ারি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জমঈয়তের জন্য তার ত্যাগ অনুসরণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ৫ কন্যাসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার সাতলাটি গ্রামের অধিবাসী। তাকে জেলা সদরের মালসাপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাইয়্যিতের জন্য মাগফিরাত কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার আবেদন জানিয়েছেন সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল খাবীর মাদানী।

আল্লাহ তাআলা মাইয়্যেতদ্বয়কে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সবরে জামিল দান করুন- আমীন।

বিশেষ মাসায়িল

রুকিয়াহ্‌র দু'আ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা গোসল করা কি বৈধ

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : আমরা বিভিন্ন অসুখবিসুখ ও রোগশোকে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি রুকিয়াহ বা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয়ে থাকি। এই রুকিয়াহ্ বা ঝাড়ফুঁকের জন্য পবিত্র কুরআনের নির্দিষ্ট সূরা, আয়াত ও হাদীসে কতিপয় দু'আ রয়েছে। তবে সে দু'আগুলো পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি ব্যবহার করা যাবে কি না সে বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। একদল মুহাক্কিক আলেম একে জায়িয বলেছেন।[৮৩]

রুকিয়াহ্'র দু'আ পাঠ করে পানি ফুঁ দিয়ে তা ব্যবহারের বৈধতার পক্ষে শাইখ সালিহ আল ফাউযান, শাইখ বকর আবূ যায়েদ, শাইখ গুদাইয়ান, আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ প্রমুখদেরও ফাতাওয়া রয়েছে। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে, সাবিত বিন কায়িস বিন শাম্মাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অসুস্থ হলে নবী (ﷺ) তার নিকটে গিয়ে পানিতে দু'আ পড়ে তা তার শরীরে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।[৮৪] **পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ :**

عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ : أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقَالَ : «اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ» ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِيْ قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ. (حكم الالبانى : ضعيف الإسناد)

সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শাম্মাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাবিত ইবনু কায়িস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলেন (আহমাদ বলেন, তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন)। তিনি বললেন,

اَكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ.

"হে মানুষের রব! সাবিত ইবনু কায়িস ইবনে শাম্মাসের রোগ দূর করে দিন।" অতঃপর তিনি বাতহান নামক উপত্যকার কিছু ধুলোমাটি নিয়ে একটি পাত্রে রাখলেন এবং পানিতে মিশিয়ে তার দেহে ঢেলে দিলেন।[৮৫]

শাইখ সালেহ আল 'উসাইমিন বলেন, "কাগজে কুরআনের আয়াত লিখে তা পানিতে ডুবিয়ে পান করা অথবা কোনো পাত্রের মধ্যে রেখে তাতে পানি দেয়ার পর ঝাঁকিয়ে পান করা অথবা পানিতে কুরআন পড়ে ফুঁ দিয়ে পান করা... এসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সুন্নত আছে বলে জানি না। তবে তিনি এও বলেছেন যে, এ বিষয়ে কোনো হাদীস না থাকলেও সালাফদের 'আমল আছে। এটি পরীক্ষিত বিষয়। তাই তাতে অসুবিধা নেই।"[৮৬]

শাইখ নাসিরুদ-দীন আলবানী (রহ) বলেন, "কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া কোনো রুকিয়াহ্ (ঝাড়ফুঁক) নেই। সুন্নাত হলো, তিলাওয়াত ছাড়া রুকিয়াহ্ নেই। কিন্তু তা কাগজে লিখে তা পানি দ্বারা ধোয়ার ব্যাপারে কোনো কোনো আলেম জায়িয বললেও আমরা হাদীসে এর কোনো দলিল পাইনি।"[৮৭]

যাহোক, প্রথমোক্ত আলেমদের মতে রুকিয়াহ্কৃত (সূরা বা দু'আ পড়া) পানি রোগীর পান করা বা তা দ্বারা গোসল করা জায়িয ইন্‌শা-আল্লাহ। এমনকি রোগী ঋতুবতী হলেও আপত্তি নেই।

তবে সবচেয়ে সঠিক নিয়ম হলো, ঝাড়ফুঁকের সূরা, আয়াত ও দু'আগুলো পড়ে রোগী নিজেই নিজের শরীরে ফুঁ দিবে অথবা অন্য কেউ পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁ দিবে। এ মর্মে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলোতে কোনো দ্বিমত নেই।

কিন্তু পানিতে রুকিয়াহ্ পড়ে রোগীর গায়ে ছিটা দেয়া, পান করতে বলা বা গোসল করাতে বলার বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। কেননা, এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি অনেক মুহাদ্দিসের মতে যঈফ– যেমনটি উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

পানিতে দম করার সঠিক নিয়ম এবং প্রচলিত ফুঁ দেয়ার পদ্ধতিগত ভ্রান্তি: পবিত্র কুরআনের নির্দিষ্ট আয়াত, সূরা এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পড়ে পানিতে ফুঁ দেয়া

---

[৮৩] *শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন বায (মজমু ফাতাওয়া বিন বায- ১/৫২)।*
[৮৪] *সুনান আবূ দাউদ- কিতাবতুত ত্বিব, সংক্ষেপিত।*
[৮৫] *এ হাদীসটিকে শাইখ আলবানী য'ঈফ/দুর্বল বলেছেন। যা'ঈফ আবূ দাউদ- হা. ৩৮৮৫।*
[৮৬] *ইবনু 'উসাইমীন : মাজমু'আ ফাতাওয়া ও রামায়িল- ১/১০৮।*
[৮৭] *ফাতাওয়া আলবানী নং- ০৪, ক্যাসেট : ৫৪৪।*

ঠিক নয়। কারণ হাদীসে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে বা পানাহারের পাত্রে ফুঁ দেয়া নিষেধ। যেমন- ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ.

“নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।”[৮৮] তবে (বৈধতার পক্ষের অভিমতকে গ্রহণ করলে) আয়াত বা দু‘আ পড়ে এমনভাবে পানিতে দম করবে যে, মুখ থেকে হালকা বাতাস বের হবে কিন্তু তার সাথে মোটেও থুথু বের হবে না বা হলেও খুবই সামান্য। আরবিতে এটাকে **نفث** বলা হয়। ইবনুল আসির বলেন,

النفث : نفخ يسير مع ريق يسير وهو أقل من التفل وقيل أنه بلا ريق. (النهاية في غريب الحديث- ٥/٨٨)

অর্থাৎ- “**نفث** বলা হয়, সামান্য মুখের লালা (যা থুথু থেকে কম) সহকারে হালকা বাতাস অথবা বলা হয়েছে, লালাবিহীন হালকা বাতাস।”[৮৯] আর পানিতে দম করার ব্যাপারে হাদীসে এই **نفث** শব্দটি এসেছে– (পূর্বোল্লিখিত সাবিত বিন কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস)।

সুতরাং আমাদের সমাজে অনেক রুকিয়াকারী (ঝাড়ফুঁককারী) বা কথিত কবিরাজ যেভাবে পানি বা খাদ্যদ্রব্যে জোরে জোরে ফুঁ দেয় বা এমনভাবে ফুঁ দেয় যে, মুখ থেকে গরম বাতাস বের হয়ে আসে তা হাদীস পরিপন্থী; বরং তা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নাক ও মুখ দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। নিঃশ্বাসে থাকে দেহের দূষিত বাষ্প ও রোগ-জীবাণুবাহী অপেক্ষাকৃত ভারী বায়বীয় পদার্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা খাবার কিংবা পানির সঙ্গে মিশে পুনরায় মানুষের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। ফলে শরীরে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর আস্তানা গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। –আল্লাহু ‘আলাম। ❑

[৮৮] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৮৮৮, হাসান সহীহ; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৭২৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৪২৯; রিয়াদুস সালেহীন- অধ্যায় : ২/ পানাহারের আদব-কায়দা, পরিচ্ছেদ– ১১৩ : পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ।*

[৮৯] *আন নিহায়াহ ফী গারিবিল- হা. ৫/৮৮।*

কবিতা

নষ্ট সংস্কৃতি

–মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম সেলিম*

তুমি সেই মুসলিম ঘরের সন্তান
মেনে চলো কুরআন সুন্নাহর বিধান
ছেড়ে দাও সকল নষ্ট সংস্কৃতি
মেনে চলো সবে প্রিয় নবীর নীতি।

কতো আয়োজন, কতো প্রয়োজন
করছি মোরা হরহামেশা,
অপসংস্কৃতি, নষ্ট নিয়মনীতি
ছেড়ে দাও সব নষ্ট তামাশা।

বিজাতীয় মতবাদ তাদের আদর্শ
করছি মোরা সদা বুকে লালন,
কিয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্তে
হবেই মোদের যে জান্নাত বারণ।

এসো সকল মু’মিন মুসলমান
ছেড়ে দাও সব নষ্ট অনুষ্ঠান।

ঝগড়া-বিতর্ক এড়িয়ে চলার প্রতিদান জান্নাত

(এক) আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাতিলের পক্ষে বিতর্ক করা ছেড়ে দেয় তার জন্য জান্নাতের একপ্রান্তে ঘর নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি হক্বের পক্ষে বিতর্কে জড়ানোর পর তা থেকে ফিরে আসে তার জন্য জান্নাতের কেন্দ্রস্থলে ঘর নির্মাণ করা হয়। আর যে তার চরিত্রকে উত্তমপন্থায় গড়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে তার জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়। তিরমিযী- হা. ১৯৯৩।

(দুই) আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একপ্রান্তে একটি ঘর প্রদানের জামিন হচ্ছি– যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ্-বিবাদ বর্জন করে চলে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘর প্রদানের জামিন হচ্ছি– যে উপহাস ছলেও মিথ্যা বর্জন করে চলে। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘর প্রদানের জামিন হচ্ছি– যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। *আবূ দাঊদ- হা. ৪৮০০, হাসান।*

** এম. এ. গালিব ট্রেডার্স, লালবাগ, সদর, দিনাজপুর।*

নিভৃত ভাবনা

ইসলামের আলোকে মাতৃভাষার গুরুত্ব-তাৎপর্য এবং ভাষাসৈনিকদের সম্মান-মর্যাদা

–মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)*

জগতের সবকিছুই মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও অকৃপণ দান। ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। যিনি যে ভাষা তার মায়ের কাছ থেকে জন্মসূত্রে লাভ করেছেন সেটাই তার মাতৃভাষা। পৃথিবীর যেকোনো ভাষাভাষীর কাছে মাতৃভাষার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি, মাতৃভাষাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ ভাষা। জাতি ও মানচিত্র ভেদে একেকজন একেক ভাষায় কথা বলে। পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। অঞ্চলভেদে ভাষার পরিবর্তন হয়। ভাষার এই বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে মহান আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন। এ ভাষা দিয়ে মানুষ নিজের মনের ভাষা প্রকাশ করে। তাই ইসলাম মায়ের প্রতি যেমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি মাতৃভাষার প্রতিও অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সব নবী-রাসূলকে স্ব-জাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছেন। যাতে তারা স্বীয় জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত স্পষ্টভাবে পৌঁছাতে পারেন। ইসলাম সকল কাজ ও যোগাযোগ মাতৃভাষায় করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছে।

সকল ভাষাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তাই কোনো ভাষাকেই অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। প্রত্যেক ভাষাই সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির দাবি রাখে। ভাষা সৃষ্টি বৈচিত্র্য করার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর মহাত্ম প্রকাশিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাষা সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন–

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।"[৯০]

আল্লাহ যুগে যুগে যত নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন তারা সকলেই নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলতেন। মানুষকে মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দিতে তারা নিজেদের মায়ের ভাষা বা মাতৃভাষা ব্যবহার করতেন। এ বিষয়টি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন–

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন আর যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৯১]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, "তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাষা।"[৯২]

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং মাতৃভাষার প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য ও শ্রদ্ধাবোধ শিক্ষা দিয়েছে।

আল হাদীসে মাতৃভাষা : নিজ নিজ মাতৃভাষার স্বকীয়তা রক্ষা করা অপরিহার্য বিষয়। মাতৃভাষাতেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন স্বজাতীর লোকদের। মাতৃভাষাতেই কুরআন নাযিল করে আরবদের জন্য সহজসাধ্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"আর আমি এ কুরআনকে তোমার মাতৃভাষায় সহজ করে দিয়েছি। যাতে মুত্তাকিদেরকে এর (বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ দিতে পার আর এর সাহায্যে কলহে লিপ্ত জাতিকে (দোজখের) ভয় দেখাতে পারো।"[৯৩]

আমাদের ইসলামের দাওয়াতকে সুন্দর ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য মাতৃভাষাকে শুদ্ধভাবে আত্মস্থ করতে হবে। প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতে হবে। তাই আমরা ভাষা দিবস উদযাপনকে শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ রাখবো না, মাতৃভাষা চর্চায় উদ্যোগী-উৎসাহী হব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষাকে গভীরভাবে ভালোবাসা আমাদের প্রকৃতির দাবি। মানবতার বন্ধু রাসূল (ﷺ) মাতৃভাষাকে ভালোবাসার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেটা যেন হয় সুন্দর-শুদ্ধ উচ্চারণে ও সুন্দর শব্দ চয়নে। তিনি বলেছেন, "তোমরা সন্তানদের কবিতা শিক্ষা দাও। কারণ এতে ভাষা সুন্দর হয়।"[৯৪]

[৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]

* *লেখক ও কলামিস্ট; **শিক্ষক**, মিল্লাত উচ্চ বিদ্যালয়, বংশাল, ঢাকা।*

[৯০] *সূরা আর্ রূম : ২২।*

[৯১] *সূরা ইব্‌রা-হীম : ৪।*

[৯২] *সূরা আর্ রহ্‌মান : ২-৪।*

[৯৩] *সূরা মারইয়াম : ৯৭।*

[৯৪] *আল হাদীস।*

কিশোর ভুবন

এসো মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি

–আবু তাসনীম*

হাসান আল বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ)।

যাকে উম্মে সালমাহ্ (রাহিমাহাল্লাহ) শৈশবে যত্নের সাথে প্রতিপালন ও দু'আ করেছিলেন।

তিনি তার দু'আয় বলেছিলেন–

'হে আল্লাহ! (তুমি হাসানের প্রতি দয়া করো। তুমি তাঁকে তোমার হাবিব মুহম্মদ (ﷺ)-এর যোগ্যতর উত্তরসূরী হিসেবে গ্রহণ করো। আর তুমি তাঁকে মুসলিম মিল্লাতের ইমাম বা নেতা বানিয়ে দাও। তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের ঝাণ্ডাকে আরো দূর-দূরান্তে পৌঁছিয়ে দেয়ার তাওফিক দান করো।'

তাঁর দু'আর ফলেই হাসান আল বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) তদানীন্তন কালে বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) অনেক সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাহচর্য লাভ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি রাসূলে কারীম (ﷺ) এর অনেক হাদীস মুখস্থ করেন। তবে তিনি সামগ্রিকভাবে হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন।

একদিনের ঘটনা হাসান বাসরি (রাহিমাহুল্লাহ) মজলিসে বসা ছিলেন।

একজন লোক এসে বললেন, জনাব! আমি জীবনে অনেক গুনাহ করেছি, কীভাবে আমার জীবনের সব গুনাহ মাফ করাতে পারবো?

তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার (মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) করো।"

একজন লোক এসে বলল,

অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না, এমন কোন 'আমল বলে দিন যা করলে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি দিবেন।

তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

"একজন লোক এসে বলল, আমি ঋণে জর্জরিত। আমি কাজ করছি, আপনি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে সম্পদ দান করেন এবং আমি ঋণমুক্ত হতে পারি।"

তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

একজন লোক এসে বলল, আমি চাই আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে সন্তান দান করেন। আপনি দু'আ করুন।

তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

একজন লোক এসে বলল আমার একটি বাগান আছে। আপনি দু'আ করুন যেন আমার বাগানে আল্লাহ ফল বেশি করে দেন। তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

একজন লোক এসে বলল, আমার ঘরে যদি পানি থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো।

তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

হাসান আল বাসরি (রাহিমাহুল্লাহ)'র এক ছাত্র পাশেই বসা ছিলেন। তিনি এসব দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, "কেন সবাইকেই বিভিন্ন সমস্যার একই সমাধান বলছেন?!"

ছাত্রটি হাসান বাসরিকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনি সকল সমস্যার একটাই সমাধান দিচ্ছেন?

হাসান বাসরি (রাহিমাহুল্লাহ) মুচকি হেসে বললেন, কেন! তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পড়নি?

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ○ يُّرْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ○ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا﴾

বলেছি– "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল; তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ তৈরি করবেন ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।"[৯৫]

মুসলিম আন্দালুসের (স্পেনের) সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্সির ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসির "আল জামি' লি-আহকামিল কুরআন"-এ উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"ইস্তিগফার (মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) হলো সবচেয়ে বড়ো নেক কাজগুলোর অন্যতম; এর ব্যাপ্তি এতো বেশি যে, যখনই কেউ নিজের 'ইবাদত, কথা ও কাজে ত্রুটি খুঁজে পায় অথবা তার রিযিকে স্বল্পতা পায় কিংবা তার হৃদয় থকে অশান্ত, তার উচিত তৎক্ষণাত ইস্তিগফারে লেগে যাওয়া।"[৯৬] ইস্তিগফার এভাবে করতে পারেন–

* আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

[৯৫] সূরা নূহ : ১০-১২।

[৯৬] মাজমূ'উ ফাতাওয়া- ১১/৬৯৮]

শুধু اَسْتَغْفِرُ اللهَ (বেশি পরিমাণে বলতে থাকা)।

﴿اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ﴾

"আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া 'ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, আর আমি তাঁরই কাছে তাওবাহ্ করছি।"

আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়।[৯৭]

﴿اَسْتَغْفِرُ اللهَ ○ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ﴾

"আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আমি তাঁরই কাছে তাওবাহ্ করছি।" সর্বোত্তম ইসতিগফার হলো– সাইয়্যিদুল ইসতিগফার। আর তা হলো–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، اغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

হে আল্লাহ! তুমিই আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকব। আমার কৃতকর্মের কুফল ও মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট মুক্তি চাই। তুমি আমাকে যেসব নিয়ামত দিয়েছ আমি সেসব নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি আর স্বীকার করছি আমার গুনাহের কথাও। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি একথাগুলো দিনের বেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলে– আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যায়, সে জান্নাতবাসী। আর যে ব্যক্তি রাত্রিবেলায় আন্তরিকতার সাথে বলে, আর সকাল হওয়ার আগেই মারা যায়, সেও জান্নাতবাসী।[৯৮]

শিক্ষা : সর্বাবস্থায় তথা ভালো মন্দ বিপদাপদে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। ❑

[৯৭] *সুনান আবূ দাউদ- ২/৮৫, জামে' আত্ তিরমিযী- ৫/৫৬৯, ৩৯০।*
[৯৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩০৬।*

...মাতৃভাষার গুরুত্ব-তাৎপর্য এবং...

[৩৭ পৃষ্ঠার পর]

ইসলামে শহীদদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। শহীদ দুই প্রকার। **এক.** ইসলামের জন্য মহান আল্লাহর পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যারা অথবা যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। **দুই.** কোনো মহামারীতে, পানিতে ডুবে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে অথবা কোনো ভবন বা স্থাপনা ধসে তার নিচে চাপা পড়ে যদি কোনো মুসলমান প্রাণ হারায়; ইসলামের দৃষ্টিতে শহীদ বলে বিবেচিত হবেন তারা। এমনিভাবে সন্তান প্রসবের সময় কোনো স্ত্রীলোক যদি মৃত্যুবরণ করেন তিনিও শহীদ বলে গণ্য হবেন। বাংলাদেশের মুসলমানগণ ভাষার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। আব্দুস সালাম, আব্দুল জব্বার, রফিক, আব্দুল বরকতরা মাতৃভাষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। অন্যের হাতে অন্যায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তারা। বর্ণনা অনুযায়ী তারাও শহীদের মর্যাদা পেতে পারেন, যদি ঈমান থাকে। আল্লাহ তা'আলা শহীদদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, "তোমরা তাদের (শহীদদের) মৃত বলো না। তারা আল্লাহর কাছে জীবিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে রিজিকপ্রাপ্ত হয়।" সুতরাং ভাষা শহীদ কিংবা যে কোনো ধরনের শহীদ হোক না কেন, আল্লাহর কাছে রয়েছে তার জন্য আলাদা মর্যাদা এবং ইসলাম তাকে প্রদান করেছে বিশেষ গুরুত্ব। ইসলাম মাতৃভাষাকে যথার্থ ও গুরুত্ব প্রদানের শিক্ষা দেয়। আর এই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে সম্মান করতে হবে, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক ভাষাভাষীর দায়িত্ব হলো, নিজ নিজ মাতৃভাষাকে সম্মানের সাথে চর্চার মাধ্যমে সমুজ্জ্বল করে তোলা। আমাদেরও উচিত হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রিয় ভাষা বাংলাকে বিশ্বের দরবারে মহীয়ান করে তোলার জন্য আকুল প্রয়াস চালানো। তবেই মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ পালিত হবে; স্রষ্টার নিয়ামতের যথার্থ কদর করায় আমরা বিশেষভাবে মূল্যায়িত হব। আর আল্লাহ একুশের যে গৌরব বাঙালি মুসলমানদেরকে দান করেছেন, তা যেন ইসলামের কল্যাণে, এই দেশের মুসলমানদের কল্যাণে আমরা ব্যবহার করতে পারি ও এ ভাষার মাধ্যমেই যেন আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি, আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন –আমীন। ❑

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

ডিএনএ টেস্ট কী এবং এই টেস্ট কতটা সঠিক?

বর্তমান জেনারেশনের কাছে ডিএনএ টেস্ট খুবই পরিচিত। এছাড়া সকলেই মোটামুটি জানেন, এই টেস্ট আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের স্বাস্থ্যসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানায়। তবে বর্তমানে এই টেস্ট নিয়েও নানান প্রশ্ন তুলছে একাংশের বৈজ্ঞানিক। তাই জেনে নেয়া যাক, ডিএনএ টেস্ট কী এবং কতটা সঠিক এই টেস্ট?

ডিএনএ টেস্ট কী : সংশ্লিষ্ট DNA Profile দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে সনাক্ত করার কৌশলকে DNA টেস্ট বলে। একে DNA পরীক্ষা DNA profiling বা genetic fingerprinting-ও বলা হয়। ১৯৮৪ সালে ইংল্যান্ডে Sir Ale Jeffreys প্রথম ডিএনএ প্রোফাইলিং কৌশল প্রয়োগ করেন। বর্তমানে ফরেনসিক বিজ্ঞানীরা এ কৌশলটি প্রয়োগ করেন।

যেভাবে করা হয় ডিএনএ টেস্ট : মরদেহের পরিচয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলে ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিয়িক এসিড) টেস্ট করেই তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে হয়। এজন্য নিহতের ডিএনএ প্রোফাইল করতে হয়। নিহতের সংখ্যা যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি মরদেহের আলাদা আলাদা ডিএনএ প্রোফাইল করতে হয়। ডিএনএ প্রোফাইল টেস্টের এই পদ্ধতি বিশ্বজনীন স্বীকৃত।

এই টেস্টের জন্য ভিকটিম বা মরদেহের দাঁত ও হাড় নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। অপরদিকে ভিকটিমের পরিবার বা স্বজনের রক্ত বা মুখের লালা সংগ্রহ করা হয়। কোনো কোনো সময় দু'টিই সংগ্রহ করা হয়। নিহতদের নমুনাকে বলা হয় 'মিসিং পার্সনস স্যাম্পল' ও স্বজনদের নমুনাকে বলা হয় 'রেফারেন্স স্যাম্পল'। রেফারেন্স স্যাম্পল টেস্ট করতে তেমন সময় লাগে না। এগুলো একদিনের ভেতরে দেয়া সম্ভব। তবে ভিকটিমদের স্যাম্পল টেস্ট করতে এবং তা প্রোফাইলিং করতে একটু সময় লাগে।'

কতটা সঠিক এই টেস্ট : বিশেষজ্ঞর মতানুযায়ী, বেশিরভাগ সময়ই এই টেস্ট সঠিক কথাই বলে। তবে কী ধরনের ডিএনএ টেস্ট হচ্ছে তার উপরই নির্ভর করে টেস্টের রেজাল্ট কেমন হবে। টেস্টের মাধ্যমে আমরা কী প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই, এটাও মাথায় রাখার বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি জিন যাকে মনোজেনিক জিন বলে, সেই জিনের মাধ্যমে টেস্ট করা হলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। কারণ এই টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যায়, কোনো অসুখের কারণে বা নিজের থেকেই জিনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন অর্থাৎ- মিউটেশন ঘটেছে কি না।

কোথায় করা যায় ডিএনএ টেস্ট : দেশে সরকারিভাবে পরিচালিত দু'টি ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি আছে।

> ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্থাপিত নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়াধীন ন্যাশনাল ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিতে যে কোনো ধরনের ডিএনএর নমুনা (হত্যা, খুন, ধর্ষণ, পিতৃত্ব নির্ণয়, অজ্ঞাত লাশের পরিচয় নির্ধারণসহ) পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রতি ৫ হাজার টাকা আগাম ফি পরিশোধ বাধ্যতামূলক।

> পুলিশের সিআইডি বিভাগ। এখানে পরীক্ষা করতে হলে আগে আদালতের অনুমতি নিয়ে ডিএনএ টেস্ট করাতে হবে। আপনাকে আগে এই ব্যাপারে আদালতে কারণ দর্শাতে হবে যে, আপনি কি কারণে ডিএনএ টেস্ট করতে চান। তারপর তারাই আপনার ডিএনএ টেস্ট করার ব্যবস্থা করে দেবে। এটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়।

> বেসরকারিভাবে দেশের বাইরে থেকে করাতে পারবেন। খরচ হবে ২৫-৫০ হাজার টাকা। *[সূত্র : ইন্টারনেট, একুশে টেলিভিশন]*

কেন রক্তদান করবেন?

'ভোগে নয় ত্যাগেই প্রকৃত সুখ' –এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মানি কত জন? আপনার একটি ভালো চিন্তা, একটি মহৎ উদ্যোগ, একটি ভালো কাজ একটি সমাজের কল্যাণ সাধনে আসতে পারে। এরূপ একটি কল্যাণকর কাজ হলো 'রক্তদান'।

মানবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে রক্ত। রক্তের বিকল্প শুধু রক্তই। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত রক্তের কোনো বিকল্প আবিষ্কার হয়নি। রক্তের অভাবে যখন কোনো মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন অন্য একজন মানুষের দান করা রক্তই তার জীবন বাঁচাতে পারে। তাই এর চেয়ে মহৎ কাজ আর হতে পারে না।

১৬ কোটি মানুষের এ দেশে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা খুবই কম।

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় সাত লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। এর বিপরীতে মাত্র ২৬ ভাগ রক্ত সংগৃহীত হয় স্বেচ্ছা রক্তদাতার মাধ্যমে। বাকি ৭৪ ভাগ রক্তের জন্য রোগীরা ছুটে যায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ পরিচিতজনদের কাছে। সেখানেও ব্যর্থ হলে তারা পেশাদার রক্ত বিক্রেতার শরণাপন্ন হয়।

যখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে অশান্তি, সংঘাত আর বিদ্বেষের বাষ্প, ঠিক তখনই আমরা পারি পৃথিবীতে ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ে এক শান্তিময় পরিবেশ তৈরি করতে। সামাজিক বন্ধন যেখানে প্রায় ভঙ্গুর, সেখানেই এই মহৎ কাজটি একটি সমাজের কল্যাণ সাধনে কাজ করতে পারে।

রক্তদান এমনই একটি প্রক্রিয়া, যেখানে অর্থ ছাড়াই শারীরিকভাবে সুস্থ একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি পারেন পরম সুখের অধিকারী হতে। তবে এ জন্য প্রয়োজন হবে, শুধুই ইচ্ছা।

আমরা হয়তো চিন্তাই করতে পারি না বা চিন্তায় আসেও না যে, হাসপাতালে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয় কিন্তু তারা রক্তের অভাবে চিকিৎসা বা অপারেশন করাতে পারছেন না। হয়তো যারা ধনী তারা অন্যত্র থেকে অর্থের বিনিময়ে কিনতে পারছেন কিন্তু যারা গরিব তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, আর আপনার আমার মতো মানুষের দিকে চেয়ে আছেন। তবে আশার বিষয় হলো, রক্তদানে সহায়তা করে এরূপ মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসছে অসংখ্য সামাজিক সংগঠন।

এরমধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাজ করে যাচ্ছে 'বাঁধন', এ ছাড়া সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে কাজ করছে 'সন্ধানী' সংগঠনটি। এদের বাইরে দেশের একটি বড়ো অংশ রক্তের জোগান দিচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। তবে অনেকেই স্থানীয় পর্যায়ে, নিজেদের উদ্যোগে এলাকাভিত্তিকভাবে রক্তদান করতে ক্লাব গঠন করেছে। আপনারাও পারেন আপনার এলাকাতে এরূপ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে। যা থেকে আপনি এবং আপনার এলাকাবাসী পেতে পারে বিবিধ উপকারসহ একটি ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধন।

আসুন! জেনে নিই রক্তদানের উপকারিতা–

মানসিক তৃপ্তি : আমি একজনের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছি, আমি অবশ্যই একটি ভালো কাজ করেছি।

বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট : এইচআইভি, ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস-বি ও সি, সিফিলিস ইত্যাদি রোগের রিপোর্ট।

গবেষণায় দেখা গেছে– রক্তদানের ফলে লোহিত রক্ত কনিকা তৈরির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, হাড়ের অস্থিমজ্জার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রক্তদানের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শ্বেত কনিকা এবং ৪ মাসের মধ্যে লোহিত কনিকা পূরণ হয়ে যায়।

রক্তদানকারীর নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে– বয়স হতে হবে ১৮-৫৭। ওজন থাকতে হবে পুরুষ-৪৭, নারী-৪৫ কেজি। রক্তচাপ (১৫০/১০০-১০০/৫০) স্বাভাবিক হতে হবে। মোটকথা শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। রক্তদাতা প্রতি চার মাস অন্তর রক্ত দিতে পারবে।

রক্তদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন– ভাইরাস জ্বর সুস্থ হওয়ার ৭ দিন পর। ডেঙ্গু থেকে সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর। ম্যালেরিয়া থেকে সুস্থ হওয়ার ১ বছর পর। টাইফয়েড, বসন্ত থেকে সুস্থ হওয়ার ৬ মাস পর। রক্তস্বল্পতা, মৃগীরোগ, একজিমা হলে দেয়া যাবে না। নারীদের ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা ও মাসিক চলাকালীন দেয়া যাবে না।

কখনোই রক্ত দিতে পারবে না– এইচআইভি পজেটিভ হলে, সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক নিলে, ক্যান্সার, হৃদরোগ, বাতজ্বর, সিফিলিস (যৌনরোগ), কুষ বা শ্বেতী ও যে কোনো রক্তবাহিত রোগ হলে রক্ত দান থেকে বিরত থাকুন।

মনে রাখতে হবে– খালি পেটে রক্ত দেয়া যাবে না। রক্তদানের পূর্বে ও পরে পানি পান করতে হবে। রক্তদানের পর ২০-৩০ মিনিট বিশ্রাম নিন। রক্তদানের পর ১ ঘণ্টার মধ্যে ভারী খাবার না খাওয়া।

রক্তদান পৃথিবীর পুণ্য কাজগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম। আমার শরীরের ৫০০ মিলি রক্তে আরেকটি জীবন রক্ষা হচ্ছে। পৃথিবীর আলো, বাতাস উপভোগের অপার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। মোটকথা, আপনি জীবনে জীবন সরবরাহ করছেন। এর থেকে বড়ো কর্ম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা জানা নেই। কত বিরাট পাওয়া, কত বিশাল অর্জন। পরোপকারই হোক আমাদের জীবনের ব্রত। একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বাঁধন। *[একুশে টেলিভিশন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : *আমাদের সমাজের মাহফিলের পোষ্টারে ও স্লোগানে "নারায় তাকবির" লিখতে ও বলতে দেখা যায়। এটা বলা যাবে কি-না। "লিল্লাহে তাকবির" বলতে হবে?*

মো. ইয়াহইয়া
মাধবকাটি, সাতক্ষীরা।

জবাব : আমাদের পাক-ভারত-বাংলাদেশের ওয়াজ-মাহফিল ও ধর্মীয় সমাবেশে 'নারায়ে তাকবির' স্লোগান প্রায় শোনা যায়। নারায়ে তাকবির দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'নারায়ে' ও 'তাকবির'। 'নারায়ে' শব্দটি ফারসি। উর্দুতেও 'নারা/নারায়ে' শব্দের ব্যবহার আছে। এর অর্থ ধ্বনী বা উচ্চ আওয়াজ। আর দ্বিতীয় অংশ 'তাকবির' আরবি শব্দ। এর অর্থ আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা, 'তাকবির' ধ্বনী দেওয়া ও 'আল্লাহু আকবার' বলা। ফারসি/উর্দু ও আরবি শব্দের সংমিশ্রণে 'নারায়ে তাকবির' অর্থ হলো, 'তোমরা উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দাও। সে হিসেবে আমরা এটা বলার মধ্যে কোনো সমস্যা দেখছি না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সম্মিলিত কণ্ঠে মহান আল্লাহর যিকির করা ইসলামী শরিয়তে জায়িয নেই।

জিজ্ঞাসা (০২) : *স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পরের দিন যদি কোনো নফল/আইয়ামে বীজ/রামাযানের রোযা রাখতে চাই তাহলে সাহরীর আগেই ফরয গোসল করতে হবে, না-কি সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি তখন করলেও হবে? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।*

আনিসুর রহমান
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : রামাযান মাসে কেউ যদি রাতের বেলা তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হয়, তাহলে তার জন্য উত্তম হলো ফজর হওয়ার আগেই গোসল করে পবিত্র হয়ে সাহুর খাওয়া। অতঃপর ফজরের সালাতের জামাআতে শরীক হওয়া। তবে কেউ যদি মনে করে গোসল করতে গেলে সাহুর খাওয়ার সময় শেষ হয়ে যাবে, তাহলে নাপাক অবস্থাতেই সাহুর খেয়ে সিয়ামের নিয়ত করে ফেলবে। নাপাক অবস্থায় রোযার নিয়ত করতে কোনো মানা নেই। সাহুর খাওয়া ও সিয়ামের নিয়ত করার পর গোসল করে ফজরের সালাতে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না। রাসূল (ﷺ)-এর এমনটা হতো। তিনি ঐ অবস্থাতেই সিয়ামের নিয়ত করে ফেলতেন। অতঃপর ফজর হওয়ার পর গোসল করে পবিত্রতা হাসিল করতেন এবং সিয়াম পূর্ণ করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৬)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : *কোন কোন সাহাবী এজিদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে কে ছিলেন।* *ইলিয়াস উদ্দিন*

চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

জবাব : বিজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর, হুসাইন বিন আলী এবং আব্দুল্লাহ বিন হানযালা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ইয়াযীদ বিন মুআবীয়ার আনুগত্য বর্জন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়– *(বিস্তারিত দেখুন : তারীখ তাবারী, ৫/৪০০, আল-কামিল ফিত্ তারীখ, ৩/১৫৭, তারিখুল ইসলাম আয্ যাহাবী, ৫/৫, আলবিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, ৮/১৮৯)*। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে যালেম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ও বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফুরী পাওয়া যায় এবং তাকে ক্ষমতা থেকে নামানোর শক্তি থাকে। কুফুরী পাওয়া গেলে এবং জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তাকে নামানোর মত শক্তি অর্জিত হলে তখন তার আনুগত্য বর্জন করা জায়েয আছে। *(দেখুন : ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর তাখরীজ সহ শারহুল 'আক্বীদাহ্ আত্ তাহাবীয়া- পৃ. ৩০৩-৩০৪)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : *গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার অন্তর্গত আমদির পাড়া কেন্দ্রীয় জামে-মসজিদের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও একজন ইমাম দিয়ে খতিব, পেশ ইমাম, মুয়াযযিম ও খাদেম-এর সব দায়িত্ব পালন করা হয়, এটা কতটুকু শরিয়তসম্মত?* *মো. রাশেদ মাহমুদ (আপেল)*

আমদির পাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

জবাব : আপনাদের ইমাম সাহেবের যদি এরকম বহুবিদ যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকে, তাহলে শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো মানা নেই। যদিও আপনাদের একাধিক লোক নিয়োগ করার মতো সামর্থ্য বিদ্যমান।

জিজ্ঞাসা (০৫) : *আমাদের এলাকার অধিকাংশ আলেম বলেন, সালাতে নবী (ﷺ) প্রথম দিকে রফউল ইয়াদাইন করেছেন পরে মানসুখ হয়ে গেছে। আসলে তাদের কথা ঠিক না জানতে চাই।* *মো. ফকরুল ইসলাম*

মাহিলাড়া, গৌরনদী, বরিশাল।

জবাব : এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এসব সুন্নাতী 'আমল রহিত হয়ে যাওয়ার কোনো দলীল নেই। রাফউল

ইয়াদায়েন রহিত হওয়া কিংবা সুন্নাত না হওয়ার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই হাদীসটি পেশ করা হয়ে থাকে।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামায দেখাব না? এরপর (তিনি নামায পড়ে দেখিয়েছেন) এবং তাতে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় দুই হাত উঠিয়েছেন। এরপর আর তা করেননি। *(মুহাল্লা- ইবনু হাযম, ৪/৮৭)*

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ মুহাদ্দিসদের মতে, এ হাদীসে ثم لم يعد অর্থাৎ- তারপর আর রাফউল ইয়াদাইন করেননি, এই বাক্যটি সহীহ নয়। এটি কোনো রাবীর ভুল কিংবা তার নিজের পক্ষ থেকে বাড়ানো হয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***কোন ক্ষেত্রে ইন্‌শা-আল্লাহ বলতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বলতে হবে না? দয়া করে জানাবেন।*** *নাম জানে অনিচ্ছুক।*

জবাব : ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্‌শা-আল্লাহ বলা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

"কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এভাবে বলবে যে, যদি আল্লাহ চান"– *(সূরা আল কাহ্‌ফ : ২৩-২৪)*। অতীত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্‌শা-আল্লাহ বলার দরকার নেই।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***একটি মসজিদে ৪ থেকে ৫ জন নামাযের মুসল্লী হয়। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি বেশি জানে সেই ব্যক্তিই নামায পড়ায়। কিন্তু সে দাড়ি হালকা খাটো করে। তার দাড়ি হালকা খাটো করার কারণে কি যে ব্যক্তি কম জানে ঐ ব্যক্তি নামায পড়াবে? এবং যে ব্যক্তি দাড়ি হালকা খাটো করে ঐ ব্যক্তির নামায হবে কি এবং ঐ ব্যক্তির পিছনে মুক্তাদিদের নামায হবে কি? এক আলেম ফাতাওয়া দেয় ঐ ইমাম ও মুক্তাদিদের নামায হবে না। ঐ ইমামকে দাড়ি হালকা খাটো করার কারণে? এই বিষয়ের সঠিক উত্তর দিবেন এবং কোন্ ব্যক্তি নামায পড়াবার যোগ্য তা বিস্তারিত বর্ণনা করবেন?*** *ইয়াহইয়া খান সাতক্ষীরা।*

জবাব : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, «يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ» "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে সুন্দর করে কুরআন পাঠ করতে পারে, সেই তোমাদের ইমামতি করবে"– *(আবূ দাউদ- হা. ৫৮৫)*। সুতরাং কোনো মসজিদে উপস্থিত একাধিক লোকের মধ্যে যে কুরআন পাঠে বেশি পারদর্শী সেই ইমামতি করার হক্বদার। যদিও তার মধ্যে কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে। যেমনটি আপনি উল্লেখ করেছেন যে, সে তার দাঁড়ি হালকা খাটো করেছে। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দাঁড়ি ওয়ালার চেয়ে দাঁড়ি ছোটকারীই প্রাধান্য পাবে। কারণ, তার মধ্যে মহান আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান বেশি আছে, যেটা ইমামতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যায়নযোগ্য। যে আলেম বলেছে দাঁড়ি ছাটা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সালাত হবে না, তার ফাতাওয়া ঠিক নয়। ঐদিকে যারা বলে কম জানা ইমামের পিছনে বেশি জানা আলেমের সালাত হবে না, তাদের ফাতাওয়াও ঠিক নয়। কেননা কম উত্তম ব্যক্তির পিছনে বেশি উত্তম ব্যক্তির ইক্তেদা করা জায়েয হওয়ার মাসআলাটি খুবই প্রসিদ্ধ।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***একজন ব্যক্তির উপর সিয়াম ফরয হওয়ার পর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও ছয় বছর সিয়াম রাখেনি। এখন সে দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে, সালাত পড়ে এবং সিয়ামও রাখে। এখন আগের সিয়ামগুলোর জন্য কি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ্ করবে, না কাযা আদায় করবে। আর যদি আদায় করতে হয় তাহলে কি এর কাফ্‌ফরা দিতে পারবে।*** *সিয়াম, বেরাইদ।*

জবাব : এই ব্যক্তি যেহেতু ছয় বছর ফরয সিয়াম রাখেনি, তার মানে হচ্ছে, তার উপর ছয় বছরের ছয়টি রামাযানের সিয়াম রয়ে গেছে। এই ব্যক্তি চরম গাফলতি করেছে এবং আল্লাহ সুস্পষ্ট হুকুম লংঘন করে মারাত্মক অপরাধ করেছে। কাল বিলম্ব না করে তার তাওবাহ্ করা আবশ্যক এবং হিসাব করে সিয়ামগুলো কাযা আদায় করা আবশ্যক। এই ব্যক্তির জন্য শুধু তাওবাহ্ যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে কাযাও করবে।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***রোযা অবস্থায় শ্বাসকষ্টের কারণে স্প্রে ব্যবহার করার হুকুম কি? এটা কি সিয়াম ভঙ্গ করবে?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব : এই স্প্রে নাকে প্রবেশ করে কিন্তু পেট পর্যন্ত পৌঁছে না। তাই আমরা বলবো, আপনি রোযা রেখে এই স্প্রে ব্যবহার করতে পারবেন। এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা এর অংশ বিশেষ পেটের মধ্যে প্রবেশ করে না। এটা উড়ে বেড়ায়, নাকে প্রবেশ করে এবং শেষ হয়ে যায়। এ থেকে আকার বিশিষ্ট কোনো কিছু তার পেটে প্রবেশ করে না। সুতরাং আপনি রোযা অবস্থায় এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এতে আপনার রোযা ভঙ্গ হবে না।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***শা'বান মাসের ফযীলতে কোনো হাদীস আছে কি?*** *আব্দুল মাজেদ*
মুয়াজ্জিন, তাক্বওয়া জামে মসজিদ, বড় দূর্গাপুর, সদর গাইবান্ধা।

জবাব : উম্মতে মুহাম্মাদীর বয়স কম। তাদের বয়স ৬০ ও সত্তরের মধ্যবর্তী। অল্প সংখ্যক লোকই এই সীমা অতিক্রম করে। উম্মতে মুহাম্মাদীর গাণিতিক বয়স কম হলেও

‘আমলী বয়স সুদীর্ঘ। অর্থাৎ- পূর্বের জাতিসমূহের তুলনায় তাদের আমলের ফযীলত বেশি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের অল্প ‘আমলের বিনিময়ে পূর্বের জাতিসমূহের প্রচুর ‘আমলের চেয়েও বেশি সওয়াব দান করেন। এটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিশেষ একটি ফযীলত।

সেই সঙ্গে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বেশ কিছু ফযীলতপূর্ণ সময় ও সওয়াবের মৌসুম দেয়া হয়েছে, যা অন্যান্য জাতিকে দেয়া হয়নি। এসব ফযীলতপূর্ণ সময়ের মধ্যে রয়েছে শা‘বান মাস। শা‘বান মাস রামাযান মাসের আগের মাস হিসেবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (ﷺ) বছরের মধ্যে শা‘বান মাসে চেয়ে অধিক সিয়াম অন্য কোনো মাসে রাখেননি– *(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৮২)*। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি অল্প কিছুদিন ব্যতীত পুরো শা‘বান মাসই সিয়াম রাখতেন। আর এটা শা‘বান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণেই।

শা‘বান মাসের ফযীলতে আরো যেসব হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

إنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ ليلةَ النِّصف مِن شعبان فيغفِرُ لجميعِ خَلْقِه إلا لمشرِكٍ أو مُشاحِنٍ.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মধ্য শা‘বানের রাত্রিতে পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক অথবা হিংসুক ছাড়া বাকি সকলকেই ক্ষমা করেন– *(সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ১৩৯০)*। একদল সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে এটা বর্ণিত হয়েছে। সনদগুলোর একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করেছে। সে হিসেবে হাদীসটিকে ইমাম আলবানী হাসান বললেও বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)-সহ অন্যান্য আলেম এটাকে দুর্বল বলেছেন। যেসব সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন মু‘আয বিন জাবাল, আবূ সা‘লাবা আল-খুশানী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, আবূ মুসা আশআরী, আবূ হুরাইরা, আবূ বকর সিদ্দীক, আওফ বিন মালেক এবং ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। কিন্তু মধ্য শা‘বানের রাতে যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা হয় এবং পরের দিন যেই সিয়াম রাখা হয়, আমাদের সমাজে শবে বরাতের নামায ও শবেবরাতের রোযা বলা হয়, তা সঠিক নয়। মধ্যে শাবানের ফযীলতে একাধিক যঈফ হাদীস বর্ণিত হলেও তার জন্য কোনো বিশেষ ‘ইবাদত নেই। হাদীসে বিশেষ কোনো ‘ইবাদতের কথা আসেনি। কোনো মুসলিমের তাওহীদ ঠিক থাকলে, তার অন্তরে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না থাকলে, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে, রাতের তাহাজ্জুদ আদায় করলে এবং রাসূল (ﷺ) শা‘বান মাসে যেভাবে সিয়াম পালন করেছেন, সেভাবে সিয়াম রাখলেই শা‘বান মাসের ফযীলত অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***মরণোত্তর দেহদান বা দেহের কোনো অঙ্গ দান করা ইসলামী শরিয়তে জায়িয, না-কি নাজায়িয? দয়া করে দলিলসহ জানাবেন।***

আহমাদ
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জবাব : কেউ যদি তার দেহের কোনো অংশ এই শর্তে দান করে যে, তার মৃত্যুর পর সেটা কেটে নেওয়া হবে, তাহলে আলেমদের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতে জায়েয আছে। কেননা ইসলামী শরিয়ত এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই অঙ্গ দান করার মধ্যে যদি কোনো মানুষের কল্যাণ অর্জিত হয়, তাহলে তা জায়েয হবে। ইসলামী শরিয়তে এটা সুসাব্যস্ত যে, মৃত মানুষের উপর জীবিতদের স্বার্থটা প্রাধান্য পাবে। তবে এই মাসআলাটিতে আলেমদের অন্য একটি মতও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, জীবিত মানুষের দেহের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার অপরাধ জীবিত মানুষকে পিটিয়ে হাড্ডী-গুড্ডী ভেঙ্গে ফেলার অপরাধের মতোই এবং জীবিত ও মৃত মানুষের হুরমত একই রকম। অতএব মৃত কিংবা জীবিত কোনো মুমিন-মুসলিমের হুরমত নষ্ট করা যাবে না। প্রথম মতের পক্ষের আলেমগণ এর জবাবে বলেছেন যে, আমাদের মতেও মৃত মুসলিম মুমিনের মর্যাদা সুসাব্যস্ত। তবে আমরা কেবল সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার দিকটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি এবং জীবিতদের স্বার্থকে মৃতদের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। দেখা যায় যে, অনেক রোগী জটিল রোগে কষ্ট পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যদি কোনো লোক বলে, আমার মৃত্যুর পর আমার কিডনী, চোখ বা অন্য কোনো অঙ্গ কোনো একজন রোগীকে দিয়ে দিতে, তাহলে এটা জায়েয হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***মৃত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম করা ইসলামী শরিয়তে জায়িয, না-কি নাজায়িয? দয়া করে দলিলসহ জানাবেন।***

আবূ আব্দুল্লাহ
টাংগাইল।

জবাব : এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে, মুসলিমের শরীরের উপর আক্রমণ না করা। জীবিত কিংবা মৃত কোনো অবস্থাতেই মুসলিমের শরীরে আঘাত করা যাবে না এবং তার হাড্ডী ভাংগা কিংবা অঙ্গহানি করা যাবে না। এটি একটি জানা বিষয়। রাসূল (ﷺ) বলেন,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

"মৃত ব্যক্তির হাড্ডী ভাংগার অপরাধ জীবিত ব্যক্তির হাড্ডী ভাংগার অপরাধের মতোই।" *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৬১৬)*

তবে ইসলামী শরিয়তের একটি বিরাট মূলনীতি হচ্ছে, تحصيل المصالح ودرء المفاسد অর্থাৎ- কল্যাণ বাস্তবায়ন ও অকল্যাণ প্রতিহত করা। আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে الارتكاب بأخف الضررين। অর্থাৎ- বিশেষ প্রয়োজনে দু'টি ক্ষতির বিষয়ের মধ্য থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর বিষয়ে লিপ্ত হওয়া। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, মৃত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম করার মধ্যে যদি মানুষের কল্যাণ থাকে, যেমন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও তার চিকিৎসা আবিষ্কারের প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম করার দরকার হয়। অনুরূপ অপরাধী ও অপরাধ সনাক্ত করার জন্যও ক্ষেত্র বিশেষে নিহত ব্যক্তির দেহ কাটার প্রয়োজন পড়ে। তাই আমরা বলতে পারি যে, বিনা প্রয়োজনে অঙ্গহানি করা কিংবা মৃত ব্যক্তির শরীর কাটা-ছেড়া করা বৈধ নয়। তবে এর মধ্যে কোনো কল্যাণ ও উপকার নিহিত থাকলে শুধু প্রয়োজন মোতাবেক কাটা জায়িয আছে।

বিস্তারিত দেখুন : সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফতোয়া, নং- ৪৭, তারিখ ৮ শাবান, ১৪২০ হি. মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া, ফতোয়ার তারিখ ২৯/২/১৯৭১ ইং।

জিজ্ঞাসা (১৩) : রোযাদার নাকে, কানে ও চোখে ড্রপ ব্যবহার করতে পারবে হুকুম কি? *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব : নাকের ড্রপ যদি নাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা লাকীত বিন সাবুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছেন,

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

"সিয়াম অবস্থায় না থাকলে ওযূর ক্ষেত্রে নাকে ভালোভাবে পানি প্রবেশ করাও"– *(আবূ দাঊদ- অধ্যায় : নাক ঝাড়া এবং তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্- অধ্যায়: পবিত্রতা)*। অতএব রোযাদারের জন্য নাকে এমনভাবে ড্রপ ব্যবহার করা জায়িয নয়, যা পেট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু পেটে না পৌঁছলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

চোখে ড্রপ ব্যবহার করা সুরমা ব্যবহার করার ন্যায়। এতে রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে কানে ড্রপ ব্যবহার করলেও রোযা বিনষ্ট হবে না। কেননা এসব দ্বারা রোযা ভঙ্গের অকাট্য কোনো দলীল নেই এবং অকাট্য দলীলের অর্থেও কোনো কিছু আসেনি। চোখ খাদ্য বা পানীয় প্রবেশের রাস্তা নয়। কানও অনুরূপ। এগুলো দ্বারা পানাহার করা যায় না। এগুলো শরীরের অন্যান্য ছিদ্রের মতোই। আলেমগণ উলেখ করেছেন, কোনো লোকের পায়ের তলায় যদি তরল কোনো জিনিষ লাগানো হয় এবং এর স্বাদ গলায় অনুভব করে, তবে তার কারণে রোযা ভাঙবে না। কেননা উহা পেটে পানাহার প্রবেশের রাস্তা নয়। অতএব সুরমা ব্যবহার করলে, চোখে বা কানে ড্রপ ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলো ব্যবহার করলে গলায় স্বাদ অনুভব করে। অনুরূপভাবে চিকিৎসার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে যদি কেউ তৈল ব্যবহার করে, তাতেও রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। এমনিভাবে কারো যদি শ্বাসকষ্ট থাকে এবং তা সহজ করার জন্য মুখ দিয়ে গ্যাস নেয়া হয়, তাতেও রোযা ভাঙবে না। কেননা তা পাকস্থলীতে পৌঁছে না। কেননা সেটা পানাহারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

জিজ্ঞাসা (১৪) : শা'বান মাসে আমাদের করণীয় কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : রামাযানের আগের মাস হিসেবে শা'বান মাসে প্রধান করণীয় হলো অধিকহারে সিয়াম রাখা। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে শাবানের চেয়ে বেশি সিয়াম রাখতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন সিয়াম রাখা বাদ দিতেন। যারা শাবান মাসের প্রথম থেকে সিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন সিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য কেউ যদি সিয়াম পালন করে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তারা সিয়াম রাখতে পারেন।

মোট কথা শাবান মাসে অধিক হারে সিয়াম পালন করা সুন্নাত। সহীহ দলীল ছাড়া কোনো রাত বা দিনকে 'ইবাদত ও সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের খেলাফ। অবশ্য যারা আইয়্যামে বীযের সিয়াম রেখে অভ্যস্ত তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শাবান উক্ত নিয়তেই সিয়াম রাখবেন। শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হলে শুধু কষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা কোনো বিদআতী 'আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

জিজ্ঞাসা (১৫) : কতটুকু দূরত্ব এবং একই সফরে কত দিন অবস্থান করলে সালাত কসর করা যাবে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। *ডা. আবু হেনা সোনাগাজী, ফেনী।*

জবাব : কত দূরের সফরে সালাত কসর করা যাবে?

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সরাসরি সহীহ মারফু হাদীসে কসরের সফরের দূরত্ব ঠিক করে দেয়া হয়নি। তবে তাঁর সফরগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আলেমগণ তা নির্ধারণ করেছেন। অধিকাংশ আলেম বর্তমান হিসাব অনুযায়ী প্রায়

আশি কিলোমিটার নির্ধারণ করেছেন। *(দেখুন : ফতোয়া লাজনা দায়িমা, ফতোয়া নং ৮/৯৯)*

কারো কারো মতে পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয়, সেই পরিমাণ দূরে গেলে সালাত কসর করা যাবে। যদিও এর দূরত্ব আশি কিলোমিটারের কম হয়। আর পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় না, তাতে কসর করা বৈধ নয়। যদিও তার দূরত্ব আশি কিলোমিটারের বেশি হয়। যেমন কেউ যদি প্রতিদিন তার বাড়ি থেকে আশি কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে চাকরি করে আবার বিকালে কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়িতে ফিরে আসে, তার এই যাতায়াতকে যেহেতু সফর বলা হয় না, তাই কর্মক্ষেত্রে সালাত কসর করা বৈধ নয়। এটাই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ও তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুমা-হ)'র মত। কেননা আল্লাহ তা'আলা কষ্টকর সফরে সালাত কসর করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু এর দূরত্ব নির্ধারণ করে দেননি। নবী (ﷺ)-ও তাঁর পবিত্র সুন্নাতে সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করে দেননি। শাইখুল ইসলামের মতটিই অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে। তবে কেউ যদি অন্যান্য আলেমদের নির্ধারণ করাটাকেই গ্রহণ করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা তারা মুজতাহিদ। আর যেখানে শরিয়তের কোনো সুস্পষ্ট ও সহীহ দলীল পাওয়া যায় না, সেখানে আলেমদের ইজতেহাদ অনুযায়ী 'আমল করাতে কোনো দোষ নেই। তবে আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, পরিষাভায় যাকে সফর বলা হয়, তাতেই সালাত কসর করার সুযোগ নেওয়াই অধিক বিশুদ্ধ মত। গন্তব্য স্থানে গিয়ে কতদিন পর্যন্ত সালাত কসর করতে পারবে?

মুসাফির যে দেশে বা অঞ্চলে সফর কররে, সেখানে গিয়ে কতদিন থাকলে কসর করতে পারবে, এই মর্মে কোনো মারফু সহীহ কাওলী হাদীস নেই। তবে নবী (ﷺ)-এর সফরগুলোতে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, তার সফরগুলো সাধারণত হজ্জ-উমরা, হিজরত ও জিহাদের সফরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবী (ﷺ) বিদায় হজ্জের বছর যুলহজ্জ মাসের চার তারিখে মক্কায় গিয়ে পৌঁছেছেন। অতঃপর সেখান থেকে আট তারিখে মীনার দিকে বের হয়েছেন। মক্কাতে তার মোট চারদিন থাকা হয়েছে। এদিনগুলোতে তিনি সালাত কসর করেছেন। এখান থেকেই আলেমগণ মুসাফিরের জন্য গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পর সর্বোচ্চ চারদিন পর্যন্ত কসর করার সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। আর যদি চারদিনের বেশি সময় থাকার নিয়ত করে, তাহলে সে শুরু থেকেই পূর্ণ সালাত আদায় করবে।

জিজ্ঞাসা (১৬) : রোযা অবস্থায় কারো দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : হ্যাঁ, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা স্বপ্নদোষ রোযা বিনষ্ট করে না এবং স্বপ্নদোষ মানুষের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। নিদ্রা অবস্থায় যা কিছু হয় তা লেখা হয় না।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয় থেকে সতর্ক করতে চাই। তা হলো বর্তমান যুগে অনেক মানুষ রামাযানের রাতে জেগে থাকে। কখনো তারা এমন কাজে রাত কাটিয়ে দেয়, যা তাদের উপকারের বদলে ক্ষতির কারণ হয়। তারপর সারাদিন গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করে। এরকম করা অনুচিত। বরং মানুষের উচিত হচ্ছে, রোযার সময়টাকে আনুগত্য, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী অন্যান্য কাজে অতিবাহিত করা।

জিজ্ঞাসা (১৭) : সগীরাহ গুনাহর সংজ্ঞা জানতে চাই? কয়েকটি সগীরাহ গুনাহ সম্পর্কে জানালে উপকৃত হবো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : সগীরাহ গুনাহ অর্থ ছোট ছোট গুনাহ। যেসব গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) সতর্ক করেছেন; কিন্তু তাতে কোনো শাস্তির কথা বলেননি, তাকেই আলেমগণ সগীরাহ বলেছেন। যা নেক 'আমল করলে এবং কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে ক্ষমা হয়ে যায় তওবার প্রয়োজন হয় না। যেমন- আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আ হতে আরেক জুম'আ, এক রামাযান হতে আরেক রামাযান এর মধ্যবর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ বলেছেন, যদি কবীরা গোনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা যায়'– *(মুসলিম, মিশকাত- হা. ৫৬৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

"তোমাদেরকে যেসব বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হচ্ছে, তা থেকে যদি বেঁচে থাকো, তাহলে তোমাদের ছোটোখাটো পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবেন।" *(সূরা আন্ নিসা : ৩১)*

সগীরা গুনাহের সংজ্ঞায় ওলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে সকল

পাপের জন্য জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর গযব, লানত প্রভৃতির কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা কবীরা গুনাহ। এমন গুনাহের সংখ্যা ৭০টির মত– *(তাফসীর কুরতুবী- ৫/১৫৯)*। সগীরা গুনাহের উদাহরণ যেমন বেগানা নারীর প্রতি অনৈতিক দৃষ্টি নিক্ষেপ, কাউকে গালি দেওয়া, হিংসা করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি। তবে সগীরা গুনাহ বার বার করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। যেমন- 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَا صَغِيْرَةَ فِي الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيْرَةَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ.

'বারবার সগীরা গোনাহ করলে সেটি আর সগীরা থাকে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করলে আর কবীরা গুনাহ থাকে না'– *(নববী, শরহ মুসলিম- ২/৮৭)*। যেমন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া সগীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ কেউ বার বার তাকালে তা কবীরা গুনাহ হয়ে যাবে– *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া- ১৫/২৯৩)*। সেজন্য রাসূল (ﷺ) ছোটো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন, হে 'আয়িশাহ্! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে'– *(ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৪৩; মিশকাত- হা. ৫৩৫৬; সহীহাহ্- হা. ৫১৩)*।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***সম্মানিত শাইখ! 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : হে 'আয়িশাহ্! তুমি ঐ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে ছোটো বলে ধারণা করা হবে। কেননা এ সমস্ত ছোটো ছোটো গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহ পক্ষ থেকে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। এই হাদীস কি সহীহ? দয়া করে জানাবেন।*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব : উপরোক্ত হাদীস সহীহ। হাদীসটির বাক্যগুলো হচ্ছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا».

(সহীহ ইবনু মাজাহ্- হা. ৫৫৪২, সিলসিলাতুস সহীহাহ্- হা. ৫১৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ২৪৭২)

জিজ্ঞাসা (১৯) : ***নিসফে শাবান বা শবে বরাতের রাতে কোনো বিশেষ নামায আছে কি না?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব : আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অর্ধ শাবানের রাত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও যঈফ, যার কোন ভিত্তি নেই। আর এটি এমন রাত্রি যার অতিরিক্ত কোন মর্যাদা নেই। তাতে কুরআন পাঠ, একাকী কিংবা জামাত বদ্ধ হয়ে কোন নামায আদায় করা যাবে না। কতিপয় আলেম এই রাতের যে ফযীলতের কথা বলেছেন, তা দুর্বল। সুতরাং এ রাতের কোন অতিরিক্ত বৈশিষ্ঠ নেই। এটিই সঠিক কথা। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দিন। *(দেখুন : ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ-এর ফতোয়া সিরিজ প্রথম খণ্ড)*

ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্ধ শাবানের রাতের ফযীলতে অনেকগুলো দুর্বল হাদীস এসেছে। সবগুলো হাদীস এক সাথে মিলালে সহীহর স্তরে পৌঁছে যায়– *(দেখুন সিলসিলায়ে সহীহাহ্- হা. ১১৪৪)*। তবে তিনি এ রাতে বিশেষ কোন এবাদত করাকে বিদআত বলে উল্লেখ করেছেন এবং কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। *(দেখুন : ইমাম আলবানীর ফতোয়া সিরিজ)*

জিজ্ঞাসা (২০) : ***শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণা কি সঠিক?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : শবে বরাতের 'ইবাদতের পক্ষের আলেমগণ বলে থাকে,

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ».

আল্লাহ তা'আলা নিসফে শা'বানের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং কৃলব গোত্রের বকরীগুলোর লোম সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন।

উপরোক্ত অর্থ বহনকারী হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনাই যঈফ বা দুর্বল– *(দেখুন : ইমাম আলবানীর তাহ্কীকসহ মিশকাত- ১/২৮৯, হা. ১২৯৯)*। ইমাম তিরিমিযী বলেন : আমি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসটি যঈফ– *(দেখুন : তিরমিযী- ২/২৫৯, হা. ৭৩৯)*। নির্দিষ্টভাবে এরাতে আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি আহ্বান জানানোর হাদীসটি সুনানের কিতাবে যঈফ ও জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া হাদীসটি বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন– কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি ক্ষমা করে দিব। অমুক আছে কি? অমুক আছে কি? এভাবে প্রতি রাতেই ঘোষণা করতে থাকেন। *(দেখুন : বুখারী- হা. ১০৯৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৮)*

সুতরাং জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সহীহ হাদীসের মর্ম প্রত্যাখ্যান করে শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার আকীদা পোষণ করা এবং সে রাতে বিশেষ ইবাদত করা সম্পূর্ণ বিদআত। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

বাংলায় ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু দারসবাড়ি

–আহমাদ রফিক★

ঐতিহাসিকদের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর ধীরে ধীরে শুরু হয় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার প্রসার। সর্বশেষ ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পরিচালিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে কওমি মাদ্‌রাসার সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এর সংখ্যা ২০ হাজারেরও বেশি। ২০০৯ সালে উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের এক তারবার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কওমি মাদ্‌রাসার সংখ্যা প্রায় ২৩ থেকে ৫৭ হাজার। এই সংখ্যা কিন্তু এক-দুইশ' বছরে হয়নি! এর বীজ বপণ করা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৫৪৪ বছর আগে।

১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের শাসনামলে বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার ছোটো সোনা মসজিদ ও কোতোওয়ালী দরজার মধ্যবর্তী ওমরপুর নামক স্থানে নির্মিত হয় "দারসবাড়ি মসজিদ।" তখন অবশ্য এর নাম ছিল "ফিরোজপুর জামে মসজিদ", কিন্তু ১৫০২ সালের ১লা রামাযান সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের শাসনামলে তারই আদেশে ফিরোজপুর মসজিদের পাশে নির্মিত হয় দারসবাড়ি মাদ্‌রাসা এবং কালক্রমে মসজিদটিও মাদ্‌রাসার নামে পরিচিতি লাভ করে।

'দারসবাড়ি' শব্দটির উৎপত্তি আরবি 'দারস' শব্দ থেকে, যার অর্থ পঠন-পাঠন। এই নামকরণ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করে, বাংলাদেশে সন্ধানপ্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন ইসলামী উচ্চবিদ্যাপীঠ হলো এই মাদ্‌রাসা।

দীর্ঘদিন মাটিচাপা পড়েছিল এ মসজিদ ও মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স। সত্তর দশকের প্রথমভাগে খনন করে মসজিদটি উদ্ধার করা হয়। কমপ্লেক্সটি দীর্ঘকাল যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বর্তমানে এর চারপাশে ঘিরে আছে বিভিন্ন প্রকার গাছগাছালির জঙ্গল।

ইট দিয়ে নির্মিত এই মসজিদের অভ্যন্তর দুই অংশে বিভক্ত। এর আয়তন দৈর্ঘ্যে ৯৯ ফুট ৫ ইঞ্চি, প্রস্থে ৩৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে একটি বারান্দা, যার আয়তন ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি। বারান্দার খিলানে ৭টি প্রস্তরস্তম্ভের উপরে একসময় ছিল ৬টি ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ, যেগুলোর মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড়ো ছিল। মসজিদের মূল ছাদের উপরে ৯টি গম্বুজের চিহ্নাবশেষ রয়েছে। মসজিদের মূল ভবনের উত্তর দক্ষিণে ৩টি করে জানালা ছিল। উত্তর পশ্চিম কোণে মহিলাদের নামাযের জন্য প্রস্তরস্তম্ভের উপরে একটি ছাদ ছিল। এর পরিচয় স্বরূপ সেখানে এখনও একটি মেহরাব অবশিষ্ট রয়েছে। এছাড়াও পশ্চিম দিকের দেয়ালে পাশাপাশি ৩টি করে মোট ৯টি কারুকার্য খচিত মেহরাব বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে। এই মসজিদের চারপাশে বর্তমানে দেয়াল ও কয়েকটি প্রস্তরস্তম্ভের গোড়া ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখানে প্রাপ্ত তোগরা অক্ষরে উৎকীর্ণ ইউসুফি শাহী লিপিটি এখন কোলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই লিপিটি আবিষ্কার করেন মুনশী এলাহী বখশ। লিপিটি দৈর্ঘ্যে ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ২ ফুট ১ ইঞ্চি।

পরিচর্যার অভাবে দারসবাড়ি মসজিদটি দিন দিন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মসজিদের কাঠামো এখনো দাঁড়িয়ে থাকলেও ধসে গেছে ছাদ, গম্বুজ ইত্যাদি। নেই নামায আদায়ের পরিবেশ। ভগ্ন দেওয়াল ও ভূগর্ভস্থ ভীত প্রমাণ করছে, একসময় এ অঞ্চল ছিল সুশিক্ষিত আধুনিক মুসলিম সভ্যতার সূতিকাগার।

নালন্দা মহাবিহার একসময় ছিল ভারতে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বিদ্যাপীঠ। এই স্থাপনাটি টিকে ছিল ৭ম শতাব্দী থেকে আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউনেস্কো নালন্দাকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৫১ সালে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে নালন্দা পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়। ২০০৬ সালে নালন্দা মহাবিহার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান প্রসারের অন্যতম কেন্দ্র ছিল দারসবাড়ি। বিভিন্ন জনপদ থেকে হাজারো শিক্ষার্থী ইসলাম শিক্ষার জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হতেন। এখানেই প্রথম কুতুবুস সিত্তাহর সমন্বিত পাঠ্যক্রমের সূচনা হয়। এখানেই মুহাম্মদ বিন ইয়াজদান বখশ নামের একজন সম্মানিত আলেম নিজ হাতে সহীহুল বুখারী লিপিবদ্ধ করেন এবং তিনিই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। শিবগঞ্জের দারসবাড়িতে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আবারও নতুন জীবন পেতে পারে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব। আমরা কী পারি না, দারসবাড়ি মাদ্‌রাসার ধ্বংসাবশেষের উপর একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি বাস্তবায়ন করে বাংলার বুকে নিজেদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ভিত্তি মজবুত করতে? ❑

★ *অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ।*